
যারা ভেবেছিল
ওরা ফ্লাইওভারে ছিল
অ ভী ক দ ত্ত

যারা ভেবেছিল ওরা ফ্লাইওভারে ছিল

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা
ফাউন্ডেশন

Jara bhebechilo ora flyover e chilo by Abhik Dutta

প্রচ্ছদ- তৌসিফ হক

https ://iwrite.app

এই বইতে দুটি নভেলা আছে। যদিও ফ্লাইওভারই এই দুটি নভেলার বিষয়, তবু জানিয়ে রাখি লেখার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিল দেখানোর কোন চেষ্টা করা হয় নি। লেখাদুটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, চরিত্রগুলিও।

অভীক দত্ত
সেপ্টেম্বর, ২০২১

যে দুটি নভেলা রইল

....

খেলা ভাঙার খেলা

আজ জ্যোৎস্না রাতে

খেলা ভাঙার খেলা

১।

ঘুমের ওষুধ আছে।

আহ!

প্রিয়ম স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

সব দোকান তো দেয় না। কেউ কেউ এমন ভাবে তাকায় যেন সে ওষুধের পাতাটা কিনেই সব ওষুধ পেটের ভিতর নিয়ে নেবে। উল্টে পড়ে থাকবে। গ্যাঁজলা বেরোবে।

ওষুধ ছাড়া কী করে ঘুমোবে সে?

ঘুম বস্তুটাই তো একমাত্র সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাও যেমন তেমন ঘুম না। ঘুম হওয়া উচিত এমন, যা সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে।

ভাত ফুটছে। প্রিয়ম হাঁড়িটা নামিয়ে ফ্যান গালতে দিয়ে ঘিয়ের শিশিটা বের করল।

এবার সমস্যাটা বুঝতে পারল।

আগের রাতেই ঘি সবটা শেষ করে ফেলেছিল। এই জন্যই মনটা খুঁত খুঁত করছিল, "কী নেই, কী নেই" বলে।

এর মানে তার কাছে ঘি ছিল না। আর সে ঘুমের ওষুধ নেই বলে চিন্তায় পড়ে যাচ্ছিল।

বিস্কুট খেয়েছে অনেকগুলো সন্ধ্যায়। ভাত না খেলেও চলে।

আলমারি থেকে টাকা বের করল।

ফ্যান গলুক। প্রিয়ম বেরোল। পাড়ার দোকানে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। দোকানের বাইরে বীরুদা বিড়ি ফুঁকছে। প্রিয়মকে দেখে বীরুদা বলল, "দশটা টাকা হবে নাকি ব্রাদার? খুব দরকার"।

দশ টাকাই দিল সে। তার মনে হল, বীরুদার কাছে সে অনেক টাকা পায়। এভাবে দশ বিশ জমতে জমতে প্রচুর টাকা হয়েছে। কোন দিন শোধ দেয় না। লোকটা কেন যে এভাবে সবার থেকে টাকা ধার নিয়ে বেড়ায়, কে জানে। সারাদিন শুধু বিড়ি খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। বড় ধার না। কোন দিন পাঁচ, কোন দিন দশ, কোন দিন কুড়ি। এভাবে সবার কাছে বীরুদার টাকা বাড়তে থাকে। বীরুদা সবাইকেই বলে রেখেছে একদিন ঠিক শোধ করে দেবে।

ভুটান দোকানে বসে মোবাইলে সিনেমা দেখছে। কানে হেডফোন।

প্রিয়ম বলল, "ঘি দাও। ছোট শিশি"।

ভুটান শুনল না।

প্রিয়ম ভুটানের হাত ধরে নাড়াল, "ছোট শিশির ঘি দাও একটা"।

ভুটান কেঁপে উঠল। তার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে শিশিটা দিল।

প্রিয়ম টাকা দিল।

ভুটান বলল, "আর কিছু?"

প্রিয়ম মাথা নেড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

পাড়ায় অনেক নতুন নতুন লোক এসছে। জমির দাম বাড়ছে। প্রোমোটারেরা অনেক বাড়ি চড়া দামে কিনে নিচ্ছে। প্রিয়ম অপেক্ষা করে আছে। বাপ ঠাকুরদার স্মৃতি জমিয়ে লাভ নেই। তার কাছে প্রস্তাব এলে সে নিয়ে নেবে।

হাতে কিছু থোক টাকা এলে কয়েকটা দেশ ঘুরে আসা যাবে।
স্বাতীর সঙ্গে বিদেশ ঘোরার লিস্ট বানাতো সে। এখনও ডায়েরীটা আছে।
প্রথম দেশের নাম “বাংলাদেশ”।
স্বাতী বলেছিল। ওদের বাড়ি ছিল রাজশাহী। স্বাতীর ইচ্ছা ছিল দেশের বাড়ি দেখতে যাবে।
প্রিয়ম হাসত, বাংলাদেশ একটা ঘোরার জায়গা হল? কেন যাবে? যে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অকারণ স্মৃতি ঘাঁটার ইচ্ছে হবেই বা কেন?
স্বাতী অনেক কিছু বোঝাতে শুরু করত হাত পা নেড়ে। বিচ্ছেদের পর প্রিয়ম সবার আগে লিস্টে বাংলাদেশের নামটা কেটেছে।
স্বাতী যে দেশগুলো ঘুরবে বলেছিল, সেগুলোর কোনটাই যাবে না সে।
দরকার নেই যাবার।
একা থাকার সমস্যাগুলো দিনের বেলা বোঝা যায় না। রাতে বোঝা যায়। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতগুলো জটিল হতে শুরু করে।
দরজার সামনে এসে প্রিয়ম দেখল একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার থেকে ছোটই হবেন। পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে এই মঙ্গলবার। এই মহিলাকে ভুটানের দোকানে যেতে দেখেছে সে।
প্রিয়ম বলল, “কোন দরকার আছে?”
মহিলা বললেন, “দেখুন না, বাড়িওয়ালা কাকুরা বাইরে গেছে। আমার হাজব্যান্ডের ফোন পাচ্ছি না কিছুতেই। ওর সেই বিকেলে আসার কথা। এখনো এল না। এখন টিভিতে দেখছি একটা ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছে। এ পাড়ায় কাউকে চিনি না। ওকে দেখেছি আপনার সঙ্গে কথা বলতে। ওকে তো আপনি চেনেন। কী করব একটু বলবেন?”
প্রিয়ম দেখল একবারে কথাগুলো বলে মহিলা কেঁদে ফেললেন। সে হতভম্ব হয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর স্বামীকে সে চেনে বলতে যেটা বলছে ব্যাপারটা ঠিক সেটা না। একদিন ভদ্রলোক বেরোচ্ছিলেন, প্রিয়মকে দেখে হেসে বলেছিলেন পাড়ায় নতুন এসেছেন। লন্ড্রির দোকানটা কোথায় জানতে চাইছিলেন। সেই কথোপকথন দেখে ভদ্রমহিলা এতদূর ভেবে ফেলেছেন হয়ত।
কী করবে? এখন কী করার থাকতে পারে? সে কী করবে? অদ্ভুত! এ মহিলা আর কোথাও যাওয়ার জায়গা পেলেন না? তার কাছেই আসতে হল?
সে বলল, “আমি ভাতের ফ্যান গালতে দিয়েছি। আপনি কি একটু অপেক্ষা করতে পারবেন? এক কাজ করুন, আপনি তৈরী হয়ে আসুন। আমি দেখছি কী করা যায়”।
মহিলা বললেন, “আমি তৈরী”।
প্রিয়ম মেয়েটির ছটফটানিটা অনুভব করতে পারল। বলল, “ঠিক আছে। তাহলে পাড়ার বাকিদের খবর দিই?”
মহিলা বললেন, “দেরী হয়ে যাবে, কাউকে চিনিও না তেমন। আমি ফোনে পাচ্ছি না ওকে। একা একা যেতে পারব না বলেই...”
প্রিয়ম বলল, “ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান”।
খিদে পেয়েছিল।
দরজা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে ভাতের হাঁড়ি তুলে বাটিতে একটু ভাত তুলে ঘি মাখিয়ে দু মুঠো খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে বাড়ির বাইরে এসে দরজায় তালা দিয়ে বলল, “চলুন”।
মহিলাটি তার দিকে একটা ব্যাগ এগিয়ে দিলেন, “এখানে হাজার পাঁচেক টাকা আছে। যদি লাগে...”
প্রিয়ম বলল, “ব্যাগটা আপনার কাছেই রাখুন। লাগলে নিচ্ছি”।
তারা হাঁটতে শুরু করল।

বীরুদা দোকানের সামনেই বিড়ি খাচ্ছিল। তাদের দেখে পিটপিট করে তাকাল।
প্রিয়ম কিছু বলল না। ভদ্রমহিলা যেভাবে টেনশন করছেন, তাতে এখানে কিছু ব্যাখ্যা করতে দাঁড়ানোর অর্থ হল সময় নষ্ট করা।
হাঁটতে হাঁটতে তারা বড় রাস্তায় এল।
কয়েকটা ট্যাক্সি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
ট্যাক্সি পাওয়া গেল যাওয়ার জন্য।
ভদ্রমহিলা অস্থির হচ্ছিলেন। প্রিয়ম বুঝতে পারছিল সেটা। বলল, "আপনার বর কোথায় কাজ করেন?"
ভদ্রমহিলা বললেন, "এসপ্ল্যানেডে। আমি সবটা জানি না"।
প্রিয়ম বললেন, "আপনার শ্বশুরবাড়িতে কাউকে কিছু বলেছেন?"
ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, "কিছু বললেই ওরা বলে আমি বেশি চিন্তা করছি"।
প্রিয়ম বলল, "তবু বলে রাখা ভাল"।
ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকালেন, "আগে খোঁজ পাই। আসলে আমাদের বিয়েটা ওরা ভাল চোখে দেখেন নি। অনেক কমপ্লিকেশন আছে"।
প্রিয়ম বলল, "ওহ"।
প্রিয়ম ঘড়ি দেখল। পৌনে দশটা বাজে।
এলাকায় শহর বাড়ছে, একটার পর একটা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে। তবু এখনও দশটা মানে এখানে রাতই।
স্বাতী কী করছে এখন? বরের জন্য রান্না করে বসে আছে? এক একটা রাত এরকম অদ্ভুতভাবে আসে, গোটা দিন কীভাবে কেটেছে বোঝা সম্ভব হয় না। প্রিয়মের মাথাও তো আগের মত কাজ করে না। ধোঁয়া ভরে থাকে যেন মাথায়। এই ভদ্রমহিলা তার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন। ঠিক কী কী করা যেত? থানায় গেলে হত? যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে... সে জিজ্ঞেস করল, "কখন ফ্লাইওভারটা ভেঙেছে?"
ভদ্রমহিলা বললেন, "সন্ধ্যে সাতটায়"।
প্রিয়ম আবার ভাবতে শুরু করল।
রিহ্যাবে থাকাকালীন বেশি ভাবতে পারত না সে। কিছুই মাথায় আসত না। এখন যেটুকু আসছে, তাতে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার স্বামীকে খুঁজতে সবার আগে অকুস্থলে যাওয়া দরকার। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।
ভদ্রমহিলা ট্যাক্সিতে উঠেই বললেন, "যেখানে ফ্লাইওভারটা ভেঙেছে, সেখানে চলুন"।
ট্যাক্সি ড্রাইভার ক্যাব স্টার্ট করে লুকিং গ্লাসে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওখানে কেউ আটকে আছে নাকি?"
ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার হাজব্যান্ড। বাড়ি ফেরেনি। ফোনেও পাচ্ছি না"।
ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, "অনেক লোক চাপা পড়ে আছে শুনেছি"।
ভদ্রমহিলা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিলেন এতক্ষণ। এবার কাঁদতে শুরু করলেন।
প্রিয়ম কিছু বলল না। সে জানলার বাইরে তাকাল।
তার মত রিহ্যাব ফেরত পাবলিক নিয়ে একজন নিখোঁজ মানুষের খোঁজ করতে বেরিয়েছেন ভদ্রমহিলা।
ব্যাপারটা ভাবলে হাসি পাচ্ছে। এখন হাসা সম্ভব না।
এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার এখনো অবশিষ্ট আছে।

২।
গাড়িতে এফ এম চলছে। হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। কত মানুষ আটকে আছে, এফ এমের আর জে নিজেও বুঝতে পারছে না। শহর জুড়ে হাহাকার যে শুরু হয়েছে, সেটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে ভদ্রমহিলা চুপ করে বসেছিলেন পাথরের মত। প্রিয়ম বলল, "এই হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন তো"।
ভদ্রমহিলা তার দিকে বিহ্বল চোখে তাকালেন।
প্রিয়ম বলল, "ঠিক আছে, আপনার স্বামীর নাম বলুন"।
ভদ্রমহিলা বললেন, "সৌমিক দাস। আমার নাম অরুন্ধতী দাস। আপনি আমার হয়ে ফোন করে দেবেন?"
হেল্পলাইনের নাম্বার বার বার এফ এমে বলছিল। প্রিয়মের তাও মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল।
সমস্যাটা মনঃসংযোগের। কিছুতেই মনটা এক জায়গায় আসে না। এক জায়গায় না এলে দশ ডিজিটের নাম্বার মনে রাখা বড় সমস্যার ব্যাপার।
মোবাইল বের করে তিন বার শোনার পরে দশটা ডিজিট পর পর লিখতে পারল প্রিয়ম। ডায়াল করতে এনগেজ টোন আসতে শুরু করল।
প্রিয়ম বলল, "এনগেজ আসছে"।
ড্রাইভার বলল, "পাবেন না দাদা। কতজন চেষ্টা করছে বলুন তো? আমার পরিচিত একজনেরও খোঁজ পাচ্ছি না। আমাদের সঙ্গেই ক্যাব চালায়। ওদিকেই ছিল। উপরের স্ল্যাবসুদ্ধ নিচে পড়েছে বলছে তো। খবর দেখছিলাম। ও দেখা যায় না"।
প্রিয়ম চেষ্টা করে যেতে লাগল। পাওয়া যাচ্ছে না।
হঠাৎ মনে হল, তার সঙ্গে স্বাতীর বিয়ে হলে ভদ্রমহিলার জায়গায় স্বাতী থাকলে এভাবেই চিন্তা করত? এখন ওর বরের জন্যও এভাবেই চিন্তা করে হয়ত। এই স্বামীর জন্য চিন্তায় ঠিক কতখানি ভালোবাসা আর কতখানি নিরাপত্তাহীনতা থাকে? যে মেয়ে চাকরি করে না, যার টাকার উৎস তার স্বামীর টাকা, সেখানে নিরাপত্তাহীনতা তো আসবেই।
এতটা ভেবে প্রিয়ম নিজেই চমৎকৃত হল। এতটা সে নিজে ভাবল? মাথা খুলছে তাহলে? এটা কি বাইরে বেরনোর ফলে হল? ঘরে থাকার জন্যই তাহলে তার মাথা কাজ করছিল না।
আরো খানিকটা ভাবার চেষ্টা করল সে। যে খানে ফ্লাইওভারটা ভেঙেছে, সেই থানায় যদি ফোন করা যায়? সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কোন থানার মধ্যে পড়ছে?"
ড্রাইভার থানার নাম বলতে প্রিয়ম থানার নাম্বার সার্চ করে সে নাম্বারে ফোন করল।
ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, "নমস্কার। বলুন"।
প্রিয়ম বলল, "আমার এক রিলেটিভকে খুঁজে পাচ্ছি না। সম্ভবত ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ার সময় ওদিকে ছিলেন। কোন খোঁজ পাওয়া যাবে স্যার?"
"আপনি হেল্প লাইনে ফোন করুন"। ও পাশ থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।
প্রিয়ম বলল, "পাচ্ছি না তো। কিছুতেই পাচ্ছি না"।
"ঠিক আছে। নাম বলুন আর আপনার ফোন নাম্বার দিন। খোঁজ পেলে জানাচ্ছি"।
প্রিয়ম ভদ্রমহিলার স্বামীর নাম আর নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে ফোন কাটল।
ড্রাইভার বলল, "কী হচ্ছে অবস্থা দাদা। আমরা বাড়ি থেকে পেটের দায়ে বেরোচ্ছি। ফিরবো নাকি কেউ জানি না। ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ছে, ভাবা যায় বলুন?"
প্রিয়ম চোখ বুজল।
অন্য দিন ঘুমের ওষুধ খেয়ে এতক্ষণে ঘুমের জন্য বিছানায় এপাশ ওপাশ শুরু হয়ে যেত। এখন ওষুধ না খেয়েও ঘুম আসছে।
জ্যাম লেগেছে রাস্তায়। মারাত্মক জ্যাম।
ড্রাইভার বলল, "দেখুন দাদা। এখনো পাঁচ কিলোমিটার বাকি। এখান থেকেই কী ঝামেলা শুরু হয়ে গেল বলুন"।

অরুন্ধতী প্রিয়মের দিকে তাকাল, "আমরা নেমে যাই? পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে চলে যাব না হয়"।
ড্রাইভার বলল, "লাভ নেই দিদি। অনেকটা রাস্তা। বসুন। অধৈর্য হবে না। ধীরে ধীরে ঠিক জ্যাম ছেড়ে দেবে"।
ভদ্রমহিলা উশখুশ করতে লাগলেন।
মানিব্যাগে পুরিয়া থাকত। খানিকটা টেনে নিলে শান্তি মনে হত। প্রিয়মের হঠাৎ মনে হতে লাগল এই সময় পুরিয়া ভীষণ কাজে দিত। রিহ্যাবে তাদের সকাল বিকাল কাউন্সেলিং করা হত। বোঝানো হত ড্রাগস কত খারাপ জিনিস। ছটফট করত প্রথম প্রথম। মায়ের টাকা জমানো থাকত ঠাকুরের পিছনে। সেখান থেকেও সে টাকা নিয়ে ড্রাগস কিনত একটা সময়। ওখানে গিয়ে দেখা গেল, সে একা নয়। অনেকেই তার মত ড্রাগস নিয়ে গিয়ে এভাবে চুরি করত। কেউ কেউ ছিনতাইও করেছে। নেশাটার জন্য সব কিছু করতে পারে মানুষ। খুনও। এই নেশা ছাড়তে বড় কষ্ট করতে হয়েছে তাকে।
অতীতকে ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলা সম্ভব না। তাহলে জীবনে স্বাতী আসার পরের সময়টা সবটুকু ইরেজার দিয়ে মুছে দিত প্রিয়ম। মাথার ভিতরে পাউডারটার দাপাদাপি স্বাতীকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল খানিকটা। রিহ্যাব থেকে ফিরে স্বাতী বার বার আসে। ওর কথা মনে পড়ে। নিজেকে সামলায় অনেক কষ্টে। সামলানোটাই আসল। সেটাই বলতেন মনোবিদ। আত্মনিয়ন্ত্রণ। এর থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না।
ট্যাক্সিটা খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ হচ্ছে, মানুষ ফুটপাথ ধরে দৌড়চ্ছে দিশেহারা হয়ে। এরকম ভিড় তো দুর্গাপুজোর সময়েও থাকে।
মানুষ মরে গেছে ফ্লাইওভারে চাপা পড়ে? কী সাংঘাতিক। অত বড় কিছু কারো মাথার উপর এসে পড়লে সে বাঁচবে কী করে? বেঁচে থাকা তো সম্ভব নয়। কিছুতেই নয়। এভাবেই মানুষ মারা যায় তাহলে? সেও তো কতভাবে মরে যাবার চেষ্টা করেছে এক কালে। হয় নি। মরতে ভীষণ সাহসের দরকার হয়। অত সাহস তার নেই। অনেক হিসেব করে দেখেছে স্বাতীর থেকে সে আদতে নিজেকেই বেশি ভালবাসে। স্বাতী চলে যাবার পর তার কষ্টটা যত না স্বাতী চলে যাবার জন্য হয়েছে, তার ঢের বেশি হয়েছে নিজের ইগোর পরাজয়ের জন্য। সে ভাবতেই পারে নি, তাকে স্বাতী ছেড়ে দিতে পারে। সে ভেবেছিল স্বাতী আর তার সম্পর্ক ভাঙবেই না। ঝগড়া, মন কষাকষি তো সব সম্পর্কে হয়। তাদের সম্পর্কেও হয়েছিল।
একদিন যে স্বাতী আর সত্যিই ফিরবে না, সে বোঝে নি। এই ভদ্রমহিলার স্বামী যদি সত্যিই মারা যান, তাহলে ইনি কী করবেন? প্রিয়মের হঠাৎ অস্থির লাগতে শুরু করল। ওই লোকটা আমার কেউ না বলে তার জন্য চিন্তা করব না, চিন্তা করার কী দরকার, এই সব সে কোন কালে ভাবতে পারে না। এখন আরো পারছিল না।
আচ্ছা, এটা কি কোন স্বপ্ন? না। নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে তো স্বাতী আসে। তার সঙ্গে কখনো তুমুল ঝগড়া হবে, কখনো তারা খুব স্বাভাবিকভাবে সংসার করবে। স্বাতী তাকে জিজ্ঞেস করবে বাজার যাবে নাকি। মাছ আনতে হবে। ঘরে কোন খাবার নেই। এখানে স্বাতী নেই। তার মানে এটা কিছুতেই স্বপ্ন না।
লেংড়ে লেংড়ে আরো খানিকটা যাবার পর গাড়ি এবার সত্যিই দাঁড়িয়ে পড়ল। পুলিশ ব্যারিকেড করে দিয়েছে।
ট্যাক্সি চালক হতাশ গলায় বলল, "দাদা, আটকে দিয়েছে"।
প্রিয়ম বলল, "ঠিক আছে"।
ট্যাক্সি চালক বলল, "ফিরবেন কী করে দাদা?"
শহরে এখনো মানুষের জন্য মানুষ ভাবে তাহলে!
৩।
তারা ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। কাতারে কাতারে মানুষ হাঁটছে। কেউ কাঁদছে। কেউ বিহ্বল হয়ে দৌড়চ্ছে। কতজনের কাছের মানুষ আজ বাড়ি ফেরে নি।

অরুন্ধতী যতটা পারে জোরে হাঁটছে। প্রিয়ম হাঁটতে হাঁটতে চারদিক দেখছে। পুলিশ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। ছয়লাপ হয়ে গেছে পুলিশে। অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ যেন মাথায় এসে মারছে। গ্যাস কাটার মেশিন নিয়ে ভ্যান যাচ্ছে। মাথার উপরের আকাশ ভেঙে পড়েছে। নাহ, আকাশ তো কংক্রিট হয়ে গেছিল। সে কংক্রিট ভেঙে এখন মানুষকে টেনে বের করতে হবে।

মিডিয়ার লোকেরা পথ চলতি মানুষদের দিকে বুম এগিয়ে দিচ্ছে। তার দিকেও একজন এগোল, "আপনার কেউ আছে ফ্লাইওভারের ওদিকে? কেউ ছিল?"

প্রিয়ম যন্ত্রের মত চোখে মিডিয়ার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই"।

মেয়েটা প্রিয়মকে কৌতূহলী আরেকজন মানুষ ভেবে ছেড়ে দিল। অরুন্ধতীর দিকে বুমটা এগিয়ে দিল।

অরুন্ধতী বলল, "আমার স্বামী আছেন। নাম সৌমিক দাস। চেনেন ওকে? আমি ওর ফোন পাচ্ছি না। বাড়িতে ফেরে নি। চেনেন?"

মিডিয়ার মেয়েটা উৎসাহ পেল। অরুন্ধতীকে বলল, "একটু দাঁড়িয়ে যাবেন? একটা বাইট নেবো আপনার"।

অরুন্ধতী আবার বিহ্বল চোখে প্রিয়মের দিকে তাকাল।

প্রিয়ম অরুন্ধতীর কনুই ধরে টান দিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকল।

মিডিয়ার মেয়েটি পেছন পেছন আসছে, "শুনুন না, বেশিক্ষণ নেবো না। জাস্ট পাঁচ মিনিট। একটা এক্সক্লুসিভ নিউজ করতে হবে। আপনারা চাইলে আমরা পে করতে পারি"।

প্রিয়ম এগোতে থাকল।

মেয়েটা আরেকজনকে ধরেছে। মানুষের কান্না প্রাইম টাইমে টি আর পি বাড়াতে খুব উপযোগী। আরবে উটের দৌড়ে বস্তায় বেঁধে শিশুদের রাখা হয়। শিশুরা যত কাঁদে। উট ততো জোরে দৌড়োয়। এই টি আর পির খেলা এখন তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যত কাঁদবে, যত কষ্ট পাবে, তত নিউজ এক্সক্লুসিভ হবে। ততো টি আর পি বাড়তে থাকবে।

ফ্লাইওভারের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল এতক্ষণে। প্রিয়ম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর!

মিডিয়া, পুলিশ, নেতা গিজগিজ করছে। গ্যাস কাটার দিয়ে কংক্রিটের চাই কাটা হচ্ছে। একটা বাসের একপ্রান্ত থেবড়ে গেছে। বেশ কয়েকজন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা রাস্তার একদিকে পড়ে আছে। রক্তাক্ত দেহ।

কেউই যেন মানুষ না। মাংস পিণ্ড!

প্রিয়ম রাস্তায় দাঁড়িয়ে বমি করে ফেলল।

যতটুকু ভাত খেয়েছিল ঘি দিয়ে, বেরিয়ে গেল।

অরুন্ধতী দৌড়েছে। যে মাংস পিণ্ডগুলো পড়ে আছে, তাদের জামা দেখছে। নাহ, কাউকে চেনা লাগছে না। এক শিশুও আছে। অরুন্ধতী কিছু ভাবতে পারছে না। সে শুধু তার বরকে খুঁজছে।

একজন পুলিশ অরুন্ধতীর দিকে এগিয়ে এলেন, "কাউকে খুঁজছেন?"

অরুন্ধতী বলল, "আমার হাজব্যান্ড। এসপ্ল্যানেড চাকরি করে। ঘরে ফেরে নি। ফোনেও পাচ্ছি না। খুঁজছি"।

একজন স্বেচ্ছা সেবিকা এগিয়ে এসে অরুন্ধতীকে ধরল।

অরুন্ধতী বলল, "আমার স্বামীর নাম সৌমিক। লাল স্ট্রাইপ দেওয়া জামা পরে বেরিয়েছিল। দেখুন না এখানে আছে নাকি"।

পুলিশ ভদ্রলোক বললেন, "অনেককেই হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানে আমরা ক্যাম্প করেছি। আপনি বসুন। লিস্ট মিলিয়ে দেখে আমরা জানাচ্ছি"।

অরুন্ধতী দিশেহারা চোখে চারদিকে দেখতে লাগল। প্রিয়মকে দেখে স্বেচ্ছা সেবিকার নাগাল থেকে বেরিয়ে ছুট লাগাল, “ওরা বলছে খুঁজছে”।
প্রিয়ম পকেটে রুমাল পেল।
মুখ মুছে বলল, “ঠিক আছে, অপেক্ষা করা যাক”।
স্বেচ্ছাসেবিকা এসে প্রিয়মকে বলল, “আপনারা প্লিজ ক্যাম্পে এসে বসুন। সি এম আসবেন। এখানে অযথা ভিড় করবেন না”।
অরুন্ধতী বলল, “ওর বাড়ির কেউ আছে কি? তাহলে উনি বুঝবেন কী করে আমার ভিতরে কী যাচ্ছে?”
স্বেচ্ছাসেবিকে অরুন্ধতীকে বলল, “প্লিজ। আমার সঙ্গে আসুন। আসুন আপনারা”।
চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে রাস্তার একপাশে। তাদের বসানো হল। জলের পাউচ দেওয়া হল।
প্রিয়ম দাঁত দিয়ে পাউচ ফুটো করে অনেকটা জল খেয়ে নিল ।
অরুন্ধতী আবার তার বরের ফোন ট্রাই করে বলল, “আন অ্যাভেলেবল বলছে। আমাকে যেতে দেবে না ওই জায়গাটায়?”
প্রিয়ম দেখল গোটা জায়গাটা আটকে দিয়েছে পুলিশ।
সে বলল, “বসুন। এখানে অপেক্ষা করুন। দেখা যাক”।
অরুন্ধতী শূন্য চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

৪।
কলেজ লাইফের নেশা আর তার পরবর্তী জীবনের নেশার মধ্যে অনেক তফাৎ থাকে।
কলেজ জীবনের নেশা হয় নিজের বাহাদুরি দেখানোর জন্য। খানিকটা সঙ্গ দায়ী থাকে, আর অনেকখানি দায়ী থাকে হঠাৎ ছাড়া গরু হয়ে যাওয়াটা।
প্রিয়ম কলেজ জীবনে কখনো মদ ছোঁয় নি। ড্রাগস নেয় নি। সিগারেট অবধি ছোঁয় নি।
স্বাতী ছেড়ে দেওয়ার পর এসব শুরু হয়ে গেল।
ভেবেছিল নেশা করলে সব ভুলে যাওয়া যায়। আদতে দেখা গেল, নেশায় ব্যথার তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। মাঝখান দিয়ে তৈরী হয়ে যায় এক মারাত্মক অভ্যাস। ড্রাগস না নিলে হাত পা কাঁপতে থাকে, সব কিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে।
মানুষ মরণশীল। ড্রাগের নেশা নয়।
ড্রাগ নেওয়ায় কোন বাহাদুরি নেই।
আছে শুধু সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়ার উপায়।
অ্যাম্বুলেন্স একটার পর একটা দেহ নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার অরুন্ধতী উঠে যাচ্ছিল।
প্রিয়মকে একজন স্বেচ্ছাসেবক কানে কানে এসে বলে গেল, “ওকে সামলান। আপনি যখন এসেছেন আপনাকেই সামলাতে হবে”।
প্রিয়ম কী করবে বুঝতে না পেরে অরুন্ধতীর হাত ধরল। অরুন্ধতী বাধা দিল না।
ঠান্ডা, বরফ শীতল একটা হাত। ভালোবাসাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ একটা হাত।
প্রিয়ম বলল, “আপনি বসে থাকুন। উঠে যাবেন না বার বার। আপনার স্বামীর খোঁজ পাওয়া গেলে ওরা ঠিক জানাবে”।
অরুন্ধতী মাথা নাড়ল, “ঠিক আছে”।
প্রিয়ম বলল, “আপনার শ্বশুরবাড়ির লোক আপনাকে মেনে নেয় নি?”
অরুন্ধতী বলল, “না। ওদের অন্য মেয়ে পছন্দ ছিল”।
প্রিয়ম বলল, “তবু, এখন মনে হয় ওদের জানানো দরকার”।

অরুন্ধতী বলল, “আজ রাতটা যাক, কোন খবর না পেলে কাল সকালে জানাবো”।
প্রিয়ম অরুন্ধতীর হাত ছাড়ল। এভাবে ধরে থাকাটা ঠিক সমুচীন মনে হচ্ছে না। প্রেম করার সময় সে মেট্রোতে কিংবা অটোতে কোন মেয়ের পাশে বসলেও তার প্রাণান্তকর চেষ্টা থাকত সে মেয়েটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার। তার মনে হত মেয়েটাকে ছুঁলে স্বাতীকে ঠকানো হবে। স্বাতীকে এই কথাটা বলার পরে স্বাতী খুব হেসেছিল।
এখন তো স্বাতী নেই। তবু প্রিয়মের মনে হল, অরুন্ধতী বিবাহিত। এতে সৌমিককে ঠকানো হবে। মাইকিং শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।
প্রিয়ম চোখ বন্ধ করল। মানুষের প্রাণের দাম দিন দিন শস্তা হয়ে যাচ্ছে।
কী করে সব ঠিক হয়ে যাবে? এভাবে তো কিছু ঠিক হয় না।
হওয়া সম্ভবও না। যে মানুষগুলো চাপা পড়ে মারা গেছে কিংবা যারা এর ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে চিরদিনের মত, তাদের পরিবার বা তারা কীভাবে ঠিক হয়ে যাবে?
এত সহজ না সব কিছু।
একের পর এক মানুষ আসছে। এখন তারা যেখানে বসে আছে, অতটা অবধিও পুলিশ আসতে দিচ্ছে না। তার আগেই ব্যারিকেড করে দিয়েছে। যারা আছে, তাদেরকেও সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ তাদের কাছে এসে বলল, “আপনারা ওদিকে চলে যান। এখানে ভিড় করবেন না। আমরা খোঁজ পেলে জানাচ্ছি”।
অরুন্ধতী আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ম বলল, “আপনি চলুন। ওদের কথাটা শোনা যাক। তর্ক করলে সমস্যা বাড়বে"।
অরুন্ধতী পড়ে যাচ্ছিল। প্রিয়ম বুঝল টেনশন নিতে পারছে না আর। স্বেচ্ছাসেবকরা এসে অরুন্ধতীকে ধরল। চেয়ারে বসানো হল।
জল দেওয়া হল।
পুলিশ এসে আরেকবার তাড়া দিচ্ছিল, অরুন্ধতীর অবস্থা দেখে তাদের ছাড় দিল।
আশে পাশের বাড়ি থেকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ সব কিছু দেখছে। নিউজ চ্যানেলেও নিশ্চয়ই সর্বত্র দেখানো শুরু হয়েছে। যাদের বাড়ির কেউ এর মধ্যে নেই, তারা কত ভাল আছে! নাকি আদৌ কেউ ভাল নেই?
নিজেরা এতটা খারাপ আছে যে অন্যের খারাপ থাকাটা উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
একজন নেতাগোছের মানুষ এসে হম্বি তম্বি করতে করতে স্পটে রওনা দিল।
অরুন্ধতী সেটা দেখে বলল, “ওই তো, উনি যেতে পারলে আমি কেন পারব না?”
প্রিয়ম বলল, “আপনি বসুন। আমি দেখছি”।
অরুন্ধতী মাথায় হাত দিয়ে বসল।
প্রিয়মও বসল। অরুন্ধতীকে গ্লুকোজ জল দেওয়া হল।
অরুন্ধতী একটু খেয়ে রেখে দিল।
প্রিয়ম বলল, “আপনি খেয়ে এসেছেন?”
অরুন্ধতী বলল, “কী করে খাই? ও ফিরলে আমরা খেয়ে নি”।
প্রিয়ম নিজের মনেই হাসল। এমনই তো কথা ছিল তাদের। সারাদিন যেখানেই থাকুক, রাতের খাবারটা সে আর স্বাতী একসঙ্গে খাবে। এদের সব কিছু ঠিক ঠাকই চলছিল। তা সত্ত্বেও তারা এখানে!
একজন অফিসার এলেন। অরুন্ধতীকে বললেন, “আপনার হাজব্যান্ডের কোন আইডি প্রুফ এনেছেন?”
অরুন্ধতী মাথা নাড়ল, “তাড়াহুড়োয় কিছু আনতে পারি নি। ওর নাম সৌমিক। লাল স্ট্রাইপ দেওয়া জামা পরেছিল”।

অফিসার বললেন, “আমাদের লিস্টে এই নামে কেউ হসপিটালাইজড হন নি। আচ্ছা, আপনি একটু শুনুন”। অফিসার প্রিয়মকে ডাকলেন।
অরুন্ধতী উঠতে যাচ্ছিল। অফিসার বললেন, “আপনি একটু বসুন। ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে”।
অরুন্ধতী বসে দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল।
অফিসার প্রিয়মকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে বললেন, “আপনি ওর কে হন?”
প্রিয়ম বলল, “প্রতিবেশী। মানে চিনিও না। পাড়ায় ওরা নতুন এসেছেন। আজকেই আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন। পাড়ায় কাউকে চেনেনও না ভদ্রমহিলা”।
অফিসার বললেন, “দেখুন আমার মনে হয় আপনি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আপনারা কনট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে যান। খবর পেলে জানাব। এখানে একটা মেস তৈরী হয়েছে। এই মেস কন্ট্রোল করা অসম্ভব। মন্দিরের সামনে একটা চাইয়ের তলায় একটা বাস চাপা পড়েছে। ওদিকে মনে হয় না কেউ বেঁচে আছে। শুধু শুধু এই পরিস্থিতিতে থাকলে উনি নার্ভাস হয়ে পড়বেন। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি? সি এম নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি দেখছেন অন্য দিকটায়। এখানে র‍্যাফ নামবে। ঝামেলায় কেন থাকবেন। মানুষ বেঁচে থাকলে ঠিকই খবর পাওয়া যায়, তাই না?”
প্রিয়ম অরুন্ধতীর দিকে তাকাল। কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। সে বলল, “বুঝতে পেরেছি অফিসার। সমস্যা হল ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যাওয়াটা। আমার মনে হয় না উনি রাজি হবেন। জোর করলে সমস্যা বাড়তে পারে”।
অফিসার বললেন, “আমি গাড়ির ব্যবস্থা করছি। উনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন এখানে থাকলে। প্লিজ আপনি দেখুন”।
প্রিয়ম কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, “ঠিক আছে”।

৫।
ড্রোন ক্যামেরা নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশের কুকুর নেমেছে। যত রাত বাড়ছে, ব্যারিকেডের বাইরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এসেছেন।
বিরোধীরা সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছেন।
প্রিয়ম চেয়ারে চোখ বুজে বসে ছিল।
কত মানুষ আছে, সব অবস্থাতেই চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সে এই ধরণের মানুষদের হিংসা করে। এটা এক দারুণ গুণ।
প্রিয়ম পারে না। কয়েক সেকেন্ড পর পর চোখ খুলে যাচ্ছে। দুঃসহনীয় এক রাত পেরোচ্ছে ঢিমে তালে।
অরুন্ধতী এক দৃষ্টিতে উদ্ধার কাজ দেখে যাচ্ছে। এ জায়গাটা জনবহুল। এরকম জায়গায় নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের তলায় প্রচুর ছোট ছোট চায়ের দোকান বসে। আশ্রয়হীন মানুষেরা রাতে এখানেই শোয়। সেসব লোকেরাও এদিক সেদিক এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশের তাড়া খেয়ে। গোটা এলাকাটা হাই অ্যালার্টে চলে গেছে। এক মহিলার স্বামীকে উদ্ধার করা গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দুজন পুলিশের কাঁধে ভর দিয়ে ভদ্রলোক ফিরলেন। হাউমাউ করে কাঁদছেন ভদ্রমহিলা। বেঁচে থাকা এতটা সুখকর? কারো বেঁচে থাকা মানুষের কাছে এতটা প্রয়োজনীয় হয়?
প্রিয়ম ফ্যালফ্যাল করে দেখছিল।
অরুন্ধতী জল খেল। তাকে বলল, “আচ্ছা ওরা তো ওর নাম জানে না। হয়ত উদ্ধার করেছে এমন অবস্থায়, কথা বলতে পারছে না। হতে পারে না? বলুন?”
প্রিয়ম বলল, “হ্যাঁ, হতেই পারে। আচ্ছা আপনার বাড়ির কাউকে বলতে পারতেন না আপনি?”
অরুন্ধতী বলল, “আমার বাবা মা দুজনেই হার্টের পেশেন্ট। কীভাবে বলি বলুন?”

প্রিয়ম বলল, "ভাই বোন?"
অরুন্ধতী বলল, "আমি একাই"।
প্রিয়ম বলল, "ওহ"।
অরুন্ধতী বলল, "আপনি একবার ওদের বলে দেখুন না। আমাকে একবার যেতে দিক। আমি ঠিক ওকে চিনে যাব। এখনো অনেকে বেঁচে আছে শুনলাম তো। চাপা পড়ে আছে"।
প্রিয়ম উঠল।
অফিসার তাকে দেখে বললেন, "এখন আর বলে লাভ নেই। গাড়ি পাওয়া যাবে না আর। তখন বললে ব্যবস্থা করা যেত। আপনারা তো যেতে চাইলেন না"।
প্রিয়ম বলল, "আমি গাড়ির জন্য আসি নি। ভদ্রমহিলা বারবার বলছেন ওকে একবার ভিতরটা যেতে দিতে। বুঝতেই পারছেন কী মারাত্মক অ্যাংজাইটি থেকে বলছেন"।
অফিসার মাথা নাড়লেন, "ইম্পসিবল। ওকে বোঝান। এমনিতেই আমরা ওর শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে এখানে ওকে বসার পারমিশন দিয়েছি। এই আবদার কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না"।
প্রিয়ম মাথা নাড়ল, "বুঝেছি"।
পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট পাওয়া গেল।
সেটা ধরাতে যেতে অফিসার বললেন, "প্লিজ এখানে স্মোক করবেন না। ওপেন রাস্তায় পুলিশের সামনে স্মোক করবেন, মিডিয়া দেখবে। আরেকটা স্কুপ নিউজ প্রচার করা শুরু করবে"।
প্রিয়ম আবার মাথা নাড়ল, "ওকে, ওকে"।
সে চুপ চাপ চেয়ারে এসে বসে অরুন্ধতীকে বলল, "হবে না। বাকিরা ঝামেলা করবে"।
অরুন্ধতী ফোন বের করে আরেকবার সৌমিককে ফোন করল। বার বার নট রিচেবল শুনেও ফোন করে যেতে লাগল।
প্রিয়মের মনে পড়ল সেও এভাবে স্বাতীর নাম্বারে ফোন করে যেত। স্বাতী সিম পাল্টে ফেলল শেষ মেশ।
স্বাতীর ফোন যখন পাওয়া যেত না, মাথা খারাপ হয়ে যেত তার। দেওয়ালে ঘুষি মেরেছে, বাথরুমে জল ছেড়ে মেঝেতে খালি গায়ে শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। বার বার মনে হয়েছে তার এতটা কষ্ট হচ্ছে, স্বাতীর কেন হচ্ছে না? কেন স্বাতীর একবারও মনে হচ্ছে না তাকে ফোন করার কথা?
এই শহরেই কোথাও সুখে সংসার করছে স্বাতী।
একবারও ওর মনে হল না প্রিয়ম কতটা কষ্ট পেতে পারে। ভাবলই না। এই কথাগুলো ভাবলে অদ্ভুত একটা রাগ জন্ম নেয় প্রিয়মের ভেতরে। সব কিছু ভাংচুর করে দিতে ইচ্ছা করে।
অরুন্ধতী ফিসফিস করে বলল, "পাওয়া যাচ্ছে না, ওর ফোন পাওয়া যাচ্ছে না"।
প্রিয়ম বলল, "চলুন ফিরি। চলুন। এত রাতে এখানে আর থাকাটা সেফ না। যাবেন?"
অরুন্ধতী বলল, "আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি বলুন? এক কাজ করুন। আপনি চলে যান"।
প্রিয়ম বলল, "শুনুন। ওরা আপনাকে যেতেও দেবে না, আর আপনার স্বামীকে উদ্ধার করা গেলে ওরা ঠিকই যা ব্যবস্থা করার করবে। আপনি অকারণ এখানে বসে আছেন। চলুন"।
অরুন্ধতী কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, "এভাবে ওকে ছেড়ে চলে যাব?"
প্রিয়ম বলল, "এখন চলুন। প্রয়োজন হলে কাল সকালে আসব? যাবেন?"
অরুন্ধতী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মাথা নাড়ল, "না"।

৬।

ভিড়ের মানুষজন কেউ হাহাকার করছে, কেউ হাপুস নয়নে কাঁদছে, কেউ তীব্র চিৎকার করে গালাগালি করছে। অফিসার ঠিকই বলেছিলেন, তুমুল নৈরাজ্য শুরু হচ্ছে আস্তে আস্তে। কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি সত্যিই

হাতের বাইরে চলে যাবে। একেই বোধ হয় নরক বলে। নরক আর কত খারাপ হবে?
প্রিয়ম বলল, "জল কিনব?"
অরুন্ধতী মাথা নাড়ল, "দরকার নেই। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে না? সরি। এক্সট্রিমলি সরি। কিছু মনে করবেন না। আমি আর পারছি না"।
প্রিয়ম বলল, "না না, ঠিক আছে। ওসব ভাববেন না"।
অরুন্ধতী বলল, "ওর বাড়ি থেকে জানা মাত্র আমাকে অপয়া দাগিয়ে দেবে জানেন তো! বলবে আমার জন্যই ছেলেটা মরে গেল। এমনিতেই সারাক্ষণ বলে যাচ্ছে, আমার জন্যই ওদের ছেলে কোন রকম যোগাযোগ রাখে না। ওদের আমার উপর অনেক রাগ"।
প্রিয়ম দেখল জনগণ ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে পারে। ফায়ার ব্রিগেডও এসে দাঁড়িয়েছে। স্বজনহারা মানুষকে কাঁদানে গ্যাস দিয়ে ভয় পাওয়ানো সম্ভব হবে না।
প্রিয়ম বেশি ভাবল না। বেশি ভেবে লাভ নেই। তার তো কেউ নেই। বেঁচে থাকাটাই তার কাছে একটা শাস্তির মত।
দশ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। মাটিতে সাদা কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে তাদের শরীরে। লাল স্ট্রাইপের জামা তাদের কেউই পরে নি। চোখ মুখ থেতলে গেছে। পুলিশ আর হাসপাতালের চাকরির থেকে কষ্ট বোধ হয় আর কিছুতে নেই। সাধারণ মানুষ চাইলে এগুলো না দেখে থাকতে পারে, পুলিশ, ডাক্তার কিংবা নার্সদের এদের সঙ্গেই থাকতে হবে।
প্রিয়ম মানিব্যাগ বের করল। প্রাণপণে মানিব্যাগের ভিতরের অংশটা শোঁকার চেষ্টা করল। কিচ্ছু পাওয়া গেল না। যা ছিল, সব বেরিয়ে চলে গেছে। এই সময়ে নেশার দরকার ছিল। নেশাগ্রস্থ মানুষ ছাড়া এই সময় পার করা সম্ভব না। মানুষকে নিয়ে চলে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সগুলো কিংবা মৃতের গাড়ির চালকদের রোবট বলে মনে হচ্ছে এখন।
আবার একটা বুম সামনে এল তার, "আপনার কেউ আছে ওখানে? ফ্যামিলি মেম্বার? বন্ধু বান্ধব?"
প্রিয়ম মরা চোখে সাংবাদিকের দিকে তাকাল। বলল, "এত রাতে কেউ টিভি দেখে? আমার ইন্টারভিউ কে দেখবে এখন?"
সাংবাদিক তার দিক থেকে বুম সরিয়ে নিল।
কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল, "লাশ সরিয়ে নিচ্ছে বুঝলি? লাশ পেলেই তো লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাবে। এরা লাশ সরিয়ে নিচ্ছে। মরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না। উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই সব লাশ চলে পাচার হয়ে যাচ্ছে"।
প্রিয়ম চেষ্টা করল কথাটা কে বলেছে শোনার জন্য। অরুন্ধতীকে কি বলা দরকার? ভেবে উঠতে পারল না সে। তাকে দূরে দেখে অরুন্ধতী ছুটে তার কাছে এসে তার হাত ধরল। বলল, "আপনি কি চলে যাবেন?"
প্রিয়ম বলল, "না না। আমি যাচ্ছি না, আপনি উঠলেন কেন? বসুন"।
অচেনা অজানা এক মহিলা এসে এভাবে তার হাত ধরছে, অন্য সময় হলে কতটা অস্বাভাবিক মনে হত! এখন কিছুই অস্বাভাবিক লাগল না।
অরুন্ধতীকে নিয়ে আবার বসাল প্রিয়ম।
অরুন্ধতী জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। প্রিয়ম বলল, "আপনার হাই বা লো প্রেশার নেই তো?"
অরুন্ধতী বলল, "কখনো চেক করি নি"।
প্রিয়মের হাত ছাড়ে নি অরুন্ধতী। প্রিয়ম কিছু বলল না। এই পরিস্থিতিতে অরুন্ধতীর মানসিক অবস্থা আর কী হবে? রাত দুটো বাজতে চলল। একজন সাংবাদিক ক্যামেরার সামনে খুব লাফ ঝাঁপ দিয়ে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। ওয়্যারলেসে পুলিশ নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে প্রিয়ম লক্ষ্য করল, অরুন্ধতীর শরীর তাকে এর মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। তার কনুই অরুন্ধতীর এক স্তনে লেগেছিল। এখন প্রবল উত্তেজনা হচ্ছে।
সে তো ভাল ছেলে। প্রেমিকা ছেড়ে গেলে প্রবল নেশা করে রিহ্যাবে যেতে হয়। অচেনা নারীর স্পর্শে হঠাৎ এরকম হবে কেন?

৭।
"হাই, আমি স্বাতীলেখা। তোমার গান শুনলাম সেদিন সোশ্যালে। খুব ভাল লাগল"।
মেয়েটা হাত বাড়াল।
প্রিয়ম ঘাবড়ে গেল প্রথমে। একটা জলজ্যান্ত মেয়ে তার গান ভাল বলছে? ওরে বাবা!
মেয়েটা আবার বলল, "হাই। কী হয়েছে? এনি প্রবলেম?"
প্রিয়ম এবার হাত বাড়াল, "না না। কোন প্রবলেম নেই। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ"।
স্বাতী বলল, "চা খাও?"
প্রিয়ম বলল, "হ্যাঁ"।
স্বাতী বলল, "নাহ। চা ভাল না। মোমো খাও? রবীন্দ্রসদন মেট্রোর ওখানে দারুণ মোমো পাওয়া যায়। খাবে?"
প্রিয়ম কিছু না ভেবেই রাজি হয়ে গেল।
মেট্রো চড়ল দুজনে। স্বাতী কথা বলতে শুরু করল।
প্রিয়ম কিছুটা কম।
মোমো খাওয়ার পর দুজনে নন্দনের ভেতরে গিয়ে বসল। আড্ডা মেরে ফেরার পর সে রাতটা স্বপ্নের মত কেটেছিল। বাড়ি ফিরেই স্বাতীর মেসেজ। "হাই। কী খবর?"
মা তখনও বেঁচে ছিল।
সে সময়টা রাতের খাওয়া সেরে সারারাত ধরে স্বাতীর সঙ্গে গল্প করত। ঘুমোতে ঘুমোতে ভোর হয়ে যেত। আজে বাজে কথা। ভুল ভাল সব বিষয়ে দুজনে কথা বলে যেত।
এরপরেই একদিন স্বাতীর আচমকা প্রস্তাব এল, "অ্যাই! ডায়মন্ড হারবার যাবে?"
প্রিয়ম অবাক হয়ে গেছিল, "কেন? কী আছে সেখানে?"
স্বাতী বলল, "রুম পাওয়া যায়"।
প্রিয়ম বুঝল। হেসে ফেলেছিল।
দুজনে কলেজ এক্সকারসানের নাম করে গেল।
দরজা বন্ধ করার পর প্রিয়মের মনে হচ্ছিল তার হৃদয় বুঝি ফেটে বেরিয়ে যাবে।
সে কী উত্তেজনা!
স্বাতী শাড়ি পরে গেছিল। কিছুতেই ব্লাউজের হুক খুলতে পারছিল না প্রিয়ম।
স্বাতী হাসতে হাসতে তাকে ফিসফিস করে বলল, "গাধা"।
পরস্পরের ঠোঁটের স্বাদ গাঢ়তর হল। একে অপরের শরীরে প্রবেশ করল গভীর আবেগে।
প্রিয়ম নিজের মধ্যে ছিল না।
স্বাতীর নগ্ন শরীরটা তাকে পাগল করে দিচ্ছিল।
সব কিছু হয়ে যাবার পর স্বাতী তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল।
আর প্রিয়মের শুধু মনে হতে লাগল, যদি পুলিশ চলে আসে!
স্বাতীকে বলতে স্বাতী তার গলায় চুমু খেয়ে বলল, "ধুর ভীতু। শুয়ে থাকো। কিচ্ছু হবে না"।

কিচ্ছু হলও না। তবু প্রিয়মের খুব ভয় হচ্ছিল। পুলিশে তার বড় ভয় ছিল। মাঝরাতে হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবার শব্দেও প্রিয়ম বার বার জানলা দিয়ে গলা বের করে দেখে গেছে পুলিশের গাড়ি না তো?
পরের দিন ভোরে হোটেল থেকে চেক আউট করে তবে শ্বাস ছেড়েছে! বাপ রে! কী চিন্তার ব্যাপার!
স্বাতী খুব হেসেছিল। সারারাস্তা খিল খিল করে হেসেছে আর বলেছে, "ভিতুর ডিম কোথাকার"।
বাড়ি ফেরার পর নিজের ঘরে শুয়ে বার বার ইচ্ছেটা আসতে শুরু করল। স্বাতীকে নগ্ন দেখার ইচ্ছা, স্বাতীর শরীরের প্রতিটি জায়গায় চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। স্বাতী ভয় দেখালো, "ধ্যাত পাগল। এরকম করে না। সত্যি সত্যিই পুলিশ চলে আসবে, তখন বুঝবে"।
পুলিশের নাম শুনে প্রিয়ম খানিকটা সিঁটিয়ে গেল বটে। ক'দিন পরে আবার শুরু করল।
সিনেমা হলের অন্ধকারে শরীরের ক্ষিদে পুরো মেটে না। শুধু চুমু খেয়ে বাড়ি ফিরে ডায়মন্ড হারবারের সে রাতের কথা বার বার মনে হতে শুরু করে। রাত জুড়ে ঘ্যান ঘ্যান করা শুরু করল প্রিয়ম।
অনেক সাধ্য সাধনার পর অবশেষে স্বাতী মেনে নিল...
ঠিক আছে। আরেকবার, অন্য কোন হোটেলে, যাওয়া যেতেই পারে।
#
"শুনুন"।
রাত তিনটে। বসে থাকতে থাকতে কখন চোখ লেগে এসেছিল বোঝে নি সে।
আশ্চর্য ব্যাপার! অন্যান্য দিন হলে তো কিছুতেই ঘুম আসত না। ঘুমের ওষুধ না খেয়ে শুলে জানলার বাইরেটায় একটা সময় ভোরের আলো ফুটে উঠত। এখানে, এই এত কিছুর মধ্যে তার ঘুম এসে গেছিল?
অরুন্ধতী ডাকছে তাকে। সে বলল, "বলুন"।
অরুন্ধতী বলল, "এখানে কোথাও বাথরুমের ব্যবস্থা আছে?"
প্রিয়ম চিন্তিত মুখে অরুন্ধতীর দিকে তাকাল।
অরুন্ধতী বলল, "আচ্ছা থাক"।
প্রিয়ম উঠল, "না। না। থাকবে কেন? আমি দেখছি"।

৮।
"উড়ালপুলের গার্ডার কংক্রিটের ভার সামলাতে পারে নি। বাঁকের মুখে পিলার থাকায় ওজনের ফারাক হয়ে গেছিল। এছাড়া তো আর কোন কারণ দেখছি না"।
রোশন শর্মা সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন মাঝরাতে।
তাকে দেখা মাত্র মিডিয়ার প্রতিনিধিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
"স্যার, আপনার কি মনে হয় এখানে কোন দুর্নীতি থাকতে পারে?" এক সাংবাদিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।
রোশন বললেন, "আমি আলটপকা কোন মন্তব্য করতে চাই না। তদন্ত হবে। এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে চলে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব"।
"স্যার এই মুহূর্তে এই ঘটনায় দেশের অন্যান্য শহরও নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে? এত এত ফ্লাইওভার উঠছে, সেগুলো যে এভাবে ভেঙে পড়তে পারে, কেউ তো ভাবে নি। আপনি কি নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে ভবিষ্যতে এরকম কিছু হবে না?"
রোশন উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা চেনা মুখ দেখলেন।
তিনি সাংবাদিকদের বললেন, "এক্সকিউজ মি"।
সাংবাদিকরা কাতর সুরে "স্যার স্যার, লাস্ট কোয়েশ্চেন" বলতে লাগল, রোশন কান দিলেন না। পুলিশ সাংবাদিকদের আটকে দিল।

রোশন দৌড়ে গিয়ে ধরলেন, “প্রিয়ম, এই যে ছোঁড়া, কেমন আছিস?”
প্রিয়ম হাঁ করে রোশনের দিকে তাকাল। রোশন কাকা! বাবার বন্ধু ছিলেন। প্রায়ই তাদের বাড়ি আসতেন। সে বলল, “ভাল আছি কাকু। আপনি সেই কবে এসেছিলেন...”
রোশন প্রিয়মের কাঁধে হাত রাখলেন, “আরে সে অনেক গল্প। তুই এখানে কী করছিস?” পরক্ষণেই সচকিত হলেন, “তোর ফ্যামিলির...? বউ... বিয়ে করেছিস?”
প্রিয়ম হাসল, “না না। সেরকম কিছু না। আমার এক প্রতিবেশী। পাড়ায় নতুন এসেছেন। ওর বরের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না”।
রোশন বললেন, “মাই গড! এটা আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ওয়ার্স্ট নাইটমেয়ার। ভাবা যাচ্ছে না”।
একজন পুলিশ অফিসার রোশনের কাছে এসে দাঁড়ালেন, “স্যার, আপনি রেড জোনে যাবেন?”
রোশন বললেন, “আমি এসে তোর সঙ্গে কথা বলছি”।
প্রিয়ম বলল, “কাকু, আপনি মেয়েটাকে ওখানে যাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন?”
রোশন মাথা নাড়লেন, “না। আমাকে সেন্ট্রাল থেকে পাঠিয়েছে। পলিটিকাল চাপান উতোর আছে অনেক। আমি কাউকে নিয়ে গেলে সেটা নিয়ে হাজার কথা উঠবে। তবে চিন্তা করিস না, আমি চেষ্টা করছি যেভাবে হোক ওর হাজব্যান্ডের ব্যাপারে খবর জোগাড় করার। আমাকে ছেলেটার নাম বল”।
প্রিয়ম ভাবতে চেষ্টা করল। অরুন্ধতীর বরের নাম... কী বলেছিল যেন?
সে “এক মিনিট” বলে দৌড়ে অরুন্ধতীর কাছে গেল। “আপনার হাজব্যান্ডের নামটা আরেকবার বলবেন?”
অরুন্ধতী আশান্বিত হয়ে তার দিকে তাকাল, “কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?”
প্রিয়ম বলল, “না না। আপনি একবার ওর নামটা বলুন”।
অরুন্ধতী মুহূর্তে নিভে গেল, “সৌমিক দাস। লাল স্ট্রাইপ দেওয়া জামা”।
প্রিয়ম আবার দৌড়ে রোশনের কাছে গেল। “কাকু, সমীর দাস। লাল স্ট্রাইপ দেওয়া জামা”।
রোশন প্রিয়মকে বললেন, “ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করছি। তুই ভাবিস না। ভাল থাক। অনেক দিন পরে তোকে দেখে ভাল লাগল। তোর বাবা মারা যাবার পর তো আর যাওয়া হল না। মা ভাল আছেন?”
প্রিয়মের মুখ ফ্যাকাসে হল, “কাকু, মাও আর নেই”।
রোশন সত্যিকারের দুঃখিত হলেন। “কীভাবে সব কিছু পাস্ট টেনস হয়ে যায়! ভাবা যায় না! ভাল থাকিস বাবু। বাই দ্য ওয়ে, তোর ফোন নাম্বারটা দে। আমি ফোন করে একদিন চলে যাবো না হয়”।
প্রিয়ম তার ফোন বের করে বলল, “এ নাও। এটা থেকে তোমার নাম্বার ডায়াল করে নাও”।
রোশন প্রিয়মের ফোন থেকে নিজের নাম্বার ডায়াল করে বললেন, “আমি এলাম। কনট্যাক্ট করিস। আর আমি দেখছি। সমীরবাবুর ব্যাপারে বলছি ওদের”।
প্রিয়ম ঘাড় নাড়ল।
রোশন ফ্লাইওভারের দিকে রওনা দিলেন।
পুলিশ অফিসার প্রিয়মকে বললেন, “আপনি ওঁকে চেনেন নাকি?”
প্রিয়ম বলল, “বাবার বন্ধু ছিলেন”।
অফিসার বললেন, “খুব সেনসিটিভ ব্যাপার এটা। উনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এসেছেন। আজে বাজে কিছু বলে ফেলেন নি তো?”
প্রিয়ম বলল, “না না। আমি সেরকম কিছুই বলি নি”।
অফিসার অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “একটা জিনিস আপনাকে বলি। ওকে বোঝান। এভাবে বসে থেকে নিজের শরীর খারাপ হওয়া ছাড়া কিন্তু কিছু হবে না। পারলে ওকে নিয়ে যান। আপনি আমার নাম্বার রাখুন। উনি যেতে চাইলে বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দেব। অসংখ্য ভিক্টিমের ফ্যামিলির লোক বাইরে অপেক্ষা

করছে। উনি অসুস্থ হয়েছেন বলে এই জোনে ওকে বসতে অ্যালাউ করা হয়েছে। সমস্যা হল বেশিক্ষণ আমরা এটা অ্যালাউ করতে পারব না। প্রেস জানতে পারলে আরেক ঝামেলা শুরু করবে। আমি তো বলছি, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওর হাজব্যান্ডের ব্যাপারটা দেখছি"।
প্রিয়ম বলল, "ঠিক আছে। আমি কথা বলছি"।
অফিসার বললেন, "ঘটনাটার জাস্ট আধঘন্টা আগে আমি এখান থেকে গেছি। আরো কত মানুষ। কী করে সবাইকে আটকাই বলুন তো। ডিউটি করতে এসেছি। কিন্তু আমরাও তো মানুষ"।
প্রিয়ম অরুন্ধতীর কাছে গিয়ে বলল, "ওরা আমাদের চলে যেতে বলছেন। কী করবেন?"
অরুন্ধতী বলল, "এখানেই থাকব। আমি বাড়ি গিয়ে কী করব? প্লিজ থাকুন"।
প্রিয়ম বলল "আচ্ছা"।

৯।
"আমার ছেলে টিউশন পড়ে ফিরছিল। এই সময়েই ফেরে ও। ক্লাস এইটে পড়ে। ওর কাছে তো মোবাইলও নেই। কোন খোঁজ পাচ্ছি না"।
এক মা কাঁদতে কাঁদতে বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। তাকে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করছে স্বেচ্ছাসেবকেরা। প্রিয়ম রাস্তাতেই বসে পড়েছে।
জীবনটা একবারে শেষই হয়ে গেল তার। অথচ এরকম তো হবার কথা ছিল না। ভাল পরিবারের ছেলে, বাবা ভাল চাকরি করতেন। বছরে দুবার বাইরে বেড়াতে যাওয়া। বাবা চলে যাবার পর থেকেই সব কিছু কেমন ঘেঁটে গেল।
মা দিশেহারা হয়ে গেলেন, প্রেশার সুগার সব হয়ে গেল। স্বাতীকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল প্রিয়ম।
প্রিয়ম স্বেচ্ছাসেবকদের দেখল। এদেরই মধ্যে একটা মেয়েকে অনুরোধ করায় অরুন্ধতীকে পরম মমতায় বাথরুমে নিয়ে গেছিল। কী ভাগ্যিস রাস্তার পাশের সুলভ শৌচাগারে কোন ক্ষতি হয় নি।
স্বাতী বলত আর কিছু না হোক, শহরের সব ক'টা সুলভ শৌচাগার তার চেনা।
দ্বিতীয়বার তারা ডায়মন্ড হারবারে যায় নি। শহরেরই একটা হোটেলে গেছিল।
স্বাতী হোটেলের রুমে এসেই বলেছিল, "দেখলে, কীভাবে রিসেপশনিস্টটা দেখছিল? এই জন্য আমার ভাল লাগে না"।
প্রিয়ম বলল, "দেখুক। কিছু যায় আসে না"।
ডায়মন্ড হারবার থেকে ফেরার পর সে শুধু কল্পনা করে গেছিল স্বাতীর শরীরের বিভিন্ন অংশে আদর করছে। প্রবল আবেগে চুমু খাচ্ছে। তারা একসঙ্গে স্নান করবে। গোটা দিন একে অপরকে আদর করে যাবে। স্বাতীর শরীরে তার আঙুল দিয়ে ছবি আঁকবে।
অনেক কিছু ভেবে এসেছিল।
বাস্তবে সেটা পারল না। এলোপাথাড়ি চুমু খেতে শুরু করল।
স্বাতী অংশগ্রহণ করল।
পৃথিবীতে শুধু তারা দুজন আছে।
আর কেউ নেই। থাকার দরকারও নেই।
প্রিয়মের মনে হচ্ছিল সে পৃথিবী জয় করেছে। আদরে আদরে ভাসিয়ে দিচ্ছিল স্বাতীকে।
হঠাৎই ছন্দপতন হল।
কলিংবেল বেজে উঠল।
সম্পূর্ণ নগ্ন দুজন।
প্রিয়মের মনে হচ্ছিল তার হৃদপিন্ড ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

সে স্বাতীকে বলল, "দেখো"।
স্বাতী বলল, "আমি কী দেখব? আমি বাথরুমে যাচ্ছি। তুমি যাও"।
কোনমতে টাওয়েল জড়িয়ে প্রিয়ম বাইরে বেরিয়ে দেখল হোটেলের বয়। বলল, "স্যার কিছু খাবেন?"
প্রিয়ম হাঁফ ছাড়ল, "না না। কিছু লাগবে না"।
ছেলেটা চলে যেতে প্রিয়ম দরজা বন্ধ করে স্বাতীকে ডাকল।
স্বাতী বেরিয়ে এসে বলল, "আমার ভাল লাগছে না। চল বেরিয়ে যাই"।
প্রিয়ম হাসল, "আগের দিন আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আর আজ তুমি? পাগল নাকি? কিছু হবে না"।
স্বাতী বলল, "শোন, তুমি বা আমি একটা চাকরি পাই, আমরা বিয়ে করি, তাহলে তো এত ভয়ের কিছু থাকবে না। বল?"
প্রিয়মের রাগ হচ্ছিল। সে স্বাতীর গলায় চুমু খেয়ে বলল, "আচ্ছা, তুমি যা বলবে তাই। শেষ বারের মত?"
স্বাতী বলল, "আমি পারছি না। কেমনভাবে সবাই দেখছিল আমাদের। চল বেরিয়ে যাই"।
প্রিয়ম হাল ছেড়ে দিল, "ঠিক আছে। চল"।
প্রবল গরম ছিল সেদিন। রোদের মধ্যে রাস্তায় বেরোল দুজনে।
মেট্রোতে চড়ল কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে। সারা রাস্তা তারা হাত ধরাধরি করে ঘুরল।
স্বাতী বলল, "এভাবে না ঘুরে কারো ফ্ল্যাট খুঁজলে হয় না?"
প্রিয়ম বলল, "আমার কাছে আরও ভাল একটা আইডিয়া আছে"।
স্বাতী বলল, "কী?"
প্রিয়ম বলল, "আমরা চুপচাপ রেজিস্ট্রি করে নি। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। যে কোন হোটেলে যেতে পারব"।
স্বাতী অবাক হয়ে প্রিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাড়ির কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করে নেব?"
প্রিয়ম বলল, "হ্যাঁ। কী অসুবিধা আছে? তোমার কি এখনো ডাউট আছে? আমরা বিয়ে করব তো একদিন? সেটা এখনই করে নি। খোঁজ নিই?"
স্বাতী ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমার কেমন ভয় ভয় লাগছে। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?"
প্রিয়ম শক্ত করে স্বাতীর হাত ধরল, "একবারে না"।

১০।
"বাবান, এই বাবান"।
সার দিয়ে মানুষের লাশ উদ্ধার হচ্ছে।
কারো পা থেঁতলে গেছে, কারো মাথা। যারা বেঁচে আছে তারা অর্ধমৃত। বেঁচে থাকাটাও যাদের কাছে শাস্তি হয়ে যাবে জীবনের বাকিটা সময়।
প্রিয়মের মলয়ের কথা মনে পড়ে গেল।
তার মনে হচ্ছে মলয় এদের মধ্যেই আছে। তাকে প্রাণপণে ডাকছে বাঁচাবার জন্য, অথচ সে মলয়কে বাঁচাতে পারছে না।
মলয়ের ক্যান্সার হয়েছিল। প্রচুর টাকার দরকার। সে তখন স্বাতী ছাড়া আর কিছুই দেখছে না।
দেখা করে এসে সবে বাড়িতে শুয়েছে, অমলদা ডাকল। বেরিয়ে দেখল পাড়ার সবাই বেরিয়েছে মলয়ের জন্য টাকা তুলতে।
টাকা দরকার। ওষুধের টাকা নেই।
"দিতে পারবি বাবান কিছু টাকা?"
প্রিয়ম বলেছিল দেখছে।

সে জানত তার কাছে টাকা আছে।
দেখছে বলে দেয় নি। সে তো জানত মলয় মরে যাবে। অকারণ টাকা দিয়ে কী লাভ? মানুষ যখন মরেই যাবে, তখন তার টাকা নষ্ট করার দরকার নেই। সে দেয় নি।
দু হাজার টাকা ছিল। অনেক দিনের জমানো। কিন্তু সে দেয় নি। বলে দিয়েছিল তার কাছে টাকা নেই। সেই টাকাটা দিয়ে স্বাতীর সঙ্গে ঘুরেছে, মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখেছে, দেড়শো টাকায় দশ টাকার পপকর্ণ কিনে খেয়েছে, কিন্তু মলয়ের চিকিৎসার জন্য কোন টাকা দেয় নি।
জ্ঞান হবার পর থেকে তারা যখন মাঠে খেলতে যেত, মলয়ের পিছনে লাগত সবাই। মলয় একটু সরল ছেলে ছিল। সে একবার মলয়কে স্ট্রাইকার ছুঁড়ে মেরেছিল ক্যারাম খেলতে গিয়ে। মলয় তাকে মারে নি। রাগও করে নি। নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখত।
দুপুরে ঘুমিয়ে ওঠার পর বুঝতে পারা যায় না, সন্ধ্যা হয়েছে না ভোর হয়েছে। এরকম এক বিকেলে মলয় তার বাড়িতে এসেছিল। তারা বাজারে গিয়ে আলুর চপ খেল। সাইকেল চালানোটাও মলয়ই তাকে শিখিয়েছিল। দু বছর বড় ছিল মলয়। সবার বাড়িতেই অবাধ যাতায়াত। আর কোন মেয়ে দেখলেই অবধারিতভাবে তার প্রেমে পড়ে যাবে। তার কাছে এসে গল্প শোনাবে মেয়েটা কত ভাল।
জীবনে প্রেমিকা চলে এলে বন্ধুরা দূর হয়ে যায়। সে শুনেছিল মলয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, জ্বর কমছেই না। তারপর টেস্ট করানোর পরে জানা গেল ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে। মলয়ের বাবা ক্লার্কের চাকরি করতেন, চিকিৎসার খরচ বেশিদিন টানতে পারলেন না। পাড়ার লোকের কাছে হাত পাততেই হত।
সবাই কিছু না কিছু দিল। প্রিয়ম "দেখছি" বলে ভুলেও গেছিল। স্বাতীর শরীরের গন্ধ তাকে প্রবলভাবে টানছে তখন। পাগলের মত সে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় স্বাতীকে নিয়ে কয়েক ঘন্টা কাটানো যায়।
একদিন সকালে খবর চলে এল। মলয় আর নেই। বাবা মার এক ছেলে ছিল।
যে বাড়িতে দীপাবলি হলেই মলয় কোত্থেকে কোত্থেকে আলো এনে জ্বালাত্, পাড়ার সবাইকে গর্ব করে বলত সে এই আলোগুলো খুব খুঁজে নিয়ে এসেছে, সেবারে মলয়দের বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ির মত একা একা দাঁড়িয়ে রইল।
মলয় আজকাল ঘুমের ওষুধ খাবার পরও মাঝে মাঝে স্বপ্নে আসে। "কী রে বাবান, ক্যারাম পিটাবি?"
মলয়ের কাছে খেলা মানে ক্যারাম পেটানো, ফুটবল পেটানো, র‍্যাকেট পেটানো।
শুইয়ে রাখা মৃতদেহগুলোর মতই মলয় শুয়ে ছিল নিশ্চয়ই একদিন।
প্রিয়ম সেদিন স্বাতীকে নিয়ে বর্ধমানে গেছিল। স্বাতী মলয়ের খবরটা শুনে বলেছিল, "তুমি গেলে না দেখতে?"
প্রিয়ম বলেছিল, "না। কষ্ট লাগে। মরে যাওয়ার পর দেখে লাভ আছে কোন?"
স্বাতী আরো কিছু বলতে গেছিল। প্রিয়ম তাকে জড়িয়ে ঠোঁটে চুমু খাওয়ায় আর কিছু বলতে পারে নি।
খোঁজ টোজ নিয়ে বিভিন্ন জায়গার হোটেলে নিয়ে যেত স্বাতীকে। যেখানে তাদের কেউ চেনে না। দেখা হলে বাড়িতে কেউ কিছু বলতে পারবে না।
স্বাতী সময় চেয়েছিল। হুট করে রেজিস্ট্রি করলে তার বাড়ির লোক কষ্ট পেতে পারে। প্রিয়ম বার বার বুঝিয়ে গেছে।
কেউ কষ্ট পাবে না। বাবা মা কেন আসবে ভালবাসার মাঝখানে?
পৌনে চারটে বাজে। খানিকক্ষণ পরে ভোর হবে। তবু অন্ধকার তো কাটছে না। প্রিয়মের মনে হচ্ছে গোটা শহরটা আরো গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যেতে শুরু করেছে। প্রতিটা মৃতদেহ মলয়। প্রতিটা মৃতদেহ তাকে বলতে চাইছে, "দশটা টাকাও কি দিতে পারতি না বাবান?"

১১।

প্রিয়ম ঘুমাচ্ছিল।
দুপুর বেলা।
কলিং বেল বেজে উঠল।
প্রিয়ম উঠে দরজা খুলে অবাক হল। স্বাতী।
স্বাতী ঘরের ভিতর ঢুকে বলল, "রিহ্যাব থেকে কবে এলে?"
প্রিয়ম স্বাতীর দিকে তাকাল। ঝলমল করছে। খুব ভাল আছে নিশ্চয়ই।
সে মানিব্যাগটা শোঁকার চেষ্টা করল।
লাভ নেই।
একটুই কিচ্ছু নেই।
এখন ভীষণ দরকার ছিল।
সব কিছু ভুলে যাওয়ার জন্য ভীষণ দরকার।
স্বাতী বলল, "লজ্জাও লাগে না তোমার। এখন বুঝি আমার ডিসিশন ঠিকই ছিল। ঠিক করেছিলাম তোমাকে ছেড়ে দিয়ে"।
প্রিয়ম শূন্য চোখে স্বাতীর দিকে তাকাল।
কষ্ট হচ্ছে একটা।
প্রবল কষ্ট।
স্বাতী বলল, "যখন যেটা নিয়ে অবসেসড হও, তখন সেটা নিয়েই পড়ে থাকো। একটা সময় শুরু করলে হোটেল খোঁজা। এদিক সেদিক যেখানে পেতে, যাবার জন্য জোরাজুরি করতে। হাঁফিয়ে গেছিলাম আমি। তুমি ম্যানিয়াক হয়ে গেছিলে, বোঝো সেটা?"
প্রিয়ম বলল, "ঘি ভাত খাই এখন। ভাল লাগে খেতে। খাবার বানাবার ঝঞ্ঝাটও নেই তেমন। খাবে?"
স্বাতী বলল, "না। তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম। দিয়ে চলে যাব। ফোন পাই নি তোমার। তাই ঠিক করলাম নিজে এসে দিয়ে যাবো। এসে দেখব আমার সিদ্ধান্ত কত ঠিক ছিল"।
প্রিয়ম বলল, "বিয়ে করছো, তাই তো?"
স্বাতী বলল, "শুধু বিয়ে কেন? অম্বরীশ তোমার মত না। আমার খোঁজ রাখে। প্রতিটা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খোঁজ রাখে আমার। তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল। একটা সেলফিশ, স্বার্থপর। আদতে তোমার বাবা মা তোমাকে বড়ই করে উঠতে পারে নি। মাকেও তো বাঁচাতে পারলে না!"
প্রিয়ম বলল, "তুমি মার খোঁজ নিয়েছিলে, আমি যখন ছিলাম না?"
স্বাতী বলল, "না। কেন খোঁজ নিতে হবে? মরে বেঁচেছেন উনি"।
প্রিয়ম বলল, "আচ্ছা। ভাল থাকো। কী নাম বললে ছেলেটার? অম্বরীশ? কী করে? এন আর আই?"
স্বাতী বলল, "হ্যাঁ। এন আর আই। বিয়ে করে আমরা সুইডেনে চলে যাচ্ছি। আর কোন দিন তোমাকে দেখতে হবে না আমার। এটাই শান্তি"।
প্রিয়ম টিভি চালাল। টিভিতে খবর দেখাচ্ছে। স্বাতী বলল, "এই তো। ভাল সঙ্গী পেয়ে গেছো। টিভি দেখো, বাবার জমানো টাকার সুদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দাও আর ঘি ভাত খাও। আর কোন মেয়ের জীবন বরবাদ কোর না দয়া করে"।
মানি প্ল্যান্ট গাছে আছে একটা তার ঘরে প্রিয়ম সেটার দিকে তাকাল। পাড়াতে একটা নার্সারি হয়েছে। ঘি কিনতে গিয়ে দেখতে গেছিল। দোকানদার বলল এই গাছটা ভাল। সে নিয়ে এল। বাড়ছে গাছটা একটু একটু করে। দেখতে দিব্যি লাগে।
স্বাতী ব্যাগ থেকে একটা বিয়ের কার্ড বের করে তার দিকে এগিয়ে দিল। প্রিয়ম কার্ডটা হাত পেতে নিল। খুব সুন্দর কার্ডটা। লাল রঙের হৃদয়ের উপর স্বাতী আর অম্বরীশের নাম লেখা।

প্রিয়ম বলল, “অনেক দিন বিয়ে বাড়ি খাই না। যাবো তবে”।
স্বাতী বলল, “একদম না। কুকুর এবং তুমি, নট অ্যালাউড আমাদের বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে। বাবা বলে দিয়েছে। আমি আজকে কেন এসেছিলাম জানো? নিজের মধ্যে যেটুকু সংশয় ছিল, সেটুকুও মেটাতে এসেছিলাম। সব কিছু শেষ করে দিয়েছিলে তুমি আমার। সারাক্ষণ সেক্স। ভালবেসেছিলে আদৌ? নাকি শুধু সেক্সটাই বড় হয়ে গেছিল?”
প্রিয়ম বলল, “এখন ঠিক বলতে পারবো না”।
স্বাতী বলল, “পারবে কী করে? এখন তো আর আমি তোমার অবসেশন না। ভুলেও কারো কথা শুনে বিয়ে টিয়ে করতে যেও না। একটা মেয়ের গোটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। বুঝেছো?”
প্রিয়ম মাথা নাড়ল। “ঠিক আছে। বিয়ে করব না”।
স্বাতী উঠে দাঁড়াল। “ঘেন্না মিশ্রিত করুণা হচ্ছে আমার তোমাকে দেখে। ছি ছি, কত বড় ভুল করে ফেলেছিলাম। ছিহ। ভাগ্যিস তোমার কথা শুনে রেজিস্ট্রিটা করতে যাই নি। তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। বেঁচে গেছি”।
প্রিয়ম বলল, “বাড়ির পিছনে একটা ছোট্ট বাগান করেছি। দেখবে?”
স্বাতী দাঁড়িয়ে গেল। “বাগান করেছো? তুমি? কই দেখি?”
স্বাতী বাগান দেখতে গেল।
প্রিয়মের আবার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল।
প্রবলভাবে নিজেকে সুস্থ রাখার যুদ্ধ...

১২।
“ওরা ব্রাহ্মণ। ভীষণ কনজারভেটিভ। আমি অতোটাও বুঝি নি। সম্পর্কটা যখন শুরু হয়েছিল, আমাকে সেভাবে কিছু আলাদা করে বলে নি ও। পরে যখন বলল, ভয় পেতাম। ওর বাবা কিছুতেই মেনে নেন নি”। অরুন্ধতী বলল।
আরেকটা লট ডেডবডি বের করা হচ্ছে।
প্রিয়ম এবার আর মুখ ফিরিয়ে নিল না।
অভ্যাস হয়ে গেছে।
অরুন্ধতীর ফোন বাজছিল।
প্রিয়ম বলল, “আপনার ফোন”।
অরুন্ধতী ফোন কানে দিয়ে উঠে গেল। প্রিয়ম অবাক হল।
তাহলে কি ওর বর ফিরে এসেছে?
নইলে এত রাতে কে ফোন করবে।
কয়েক মিনিট পরে অরুন্ধতী তার পাশে এসে বসল। প্রিয়ম বলল, “কে ফোন করেছিল?”
অরুন্ধতী প্রিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, “গাঁড় মারাক। অনেক গল্প দিয়েছি। মেয়েটার লাশ কোথায় লুকিয়েছিস? সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না?”
প্রিয়ম চমকে উঠল, বলল, “মানে? আ... আপনি কে?”
অরুন্ধতী প্রিয়মের গালে সজোরে চড় কষাল একটা। বলল, “স্পেশাল ব্রাঞ্চ চল। তুই বলবি লাশটা কোথায় লুকিয়েছিস। তোকে এতক্ষণ বের করে নিয়ে এসেও কোন হদিশ পেল না কেউ”।
প্রিয়মের মাথা ঘুরে গেল।
সে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

অরুন্ধতী একজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে তার আই কার্ড দেখিয়ে বলল, "এটা একটা সাইকো। সম্ভবত বাড়িতে ওর লাভারকে মেরে লুকিয়ে রেখেছে। মেয়েটার বাড়ি থেকে কেস ডায়েরী করেছিল। আজ সকালেই ভাবছিলাম কী করে এটাকে বাড়ি থেকে বের করে তল্লাশি চালানো যায়। ফ্লাইওভার কেসটা হল বলে গল্প দিয়ে নিয়ে এসেছি। তবু কিছু পাওয়া গেল না। গাড়ির ব্যবস্থা করুন। ইমিডিয়েটলি এটাকে নিয়ে যেতে হবে। অনেক অভিনয় করেছি। ভেবেছিলাম আজকেই পেয়ে যাবে। কিচ্ছু পাওয়া যায় নি। সামথিং ইজ ভেরি ফিশি"।

প্রিয়মের মাথা কাজ করছিল না। কী বলছে অরুন্ধতী? সে স্বাতীকে খুন করেছে?

অফিসার বললেন, "ও মাই গড! আমাকে আগে বলবেন তো। এর সঙ্গে আমি কত কথা বলে ফেললাম। শিট"।

অরুন্ধতী বলল, "আপনাদের ইচ্ছা করেই বলি নি, ব্যাপারটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেছিলাম যাতে এর মনে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়"।

অরুন্ধতীকে এখন চেনা যাচ্ছে না। দুজন কনস্টেবল জোগাড় হয়ে গেল।

তাকে গাড়িতে তোলা হল।

প্রিয়ম নির্জীবের মত গাড়িতে বসে রইল।

বিড় বিড় করে যাচ্ছে, "কী আজে বাজে কথা! আমি নাকি স্বাতীকে খুন করেছি? স্বাতী তো এখন সুখে সংসার করছে। বর এলে নিশ্চয়ই রান্না করে খাওয়ায়"।

অরুন্ধতী ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে। ভোর হচ্ছে।

প্রিয়ম বলল, "আপনার মনে হয় কোন ভুল হচ্ছে। স্বাতী তো সংসার করছে। এতদিনে বাচ্চাও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ওকে কেন খুন করতে যাব?"

অরন্ধতী বলল, "তুই চুপ করে থাক। একটা কথা বলবি না। শালা ড্রাগ অ্যাডিক্ট। তোর জন্য সারা রাত জেগে রইলাম আমি। যে কোন দিন মেগা সিরিয়ালে অ্যাক্টিং করব মনে হচ্ছে এবার"।

প্রিয়ম বলল, "আপনাদের কোন ভুল হচ্ছে"।

অরুন্ধতী বলল, "ঠিক আছে। তুই চল। দেখছি কার ভুল"।

ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে তার বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়াল।

পাড়ার লোক এই ভোরেও অবাক হয়ে দেখছে প্রিয়মের বাড়ি তল্লাশি চলছে।

অরুন্ধতী গাড়ি থেকে নেমে বলল, "চল। চল"।

ঠেলতে ঠেলতে প্রিয়মকে তার বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হল।

একজন অরুন্ধতীকে স্যালুট করে বলল, "গোটা ঘর খুঁজেছি ম্যাম। সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিচ্ছু পাই নি"।

অরুন্ধতী বলল, "হতেই পারে না। লাস্ট সান ডে মেয়েটা এ বাড়িতে এসেছিল। তারপর থেকে আর ফেরে নি"।

প্রিয়ম বলল, "স্বাতী সেই কবে ছেড়ে গেছে আমাকে। কতদিন দেখি না"।

অরুন্ধতী তীক্ষ্ণ চোখে প্রিয়মের দিকে তাকিয়ে বলল, "কত দিন?"

প্রিয়ম বলল, "তিন বছর হয়ে গেছে"।

অরুন্ধতী প্রিয়মকে চেয়ার টেনে বসালো, "বস"।

প্রিয়ম বসল।

অরুন্ধতী বলল, "দ্যাখ, সারারাত অনেক কষ্ট গেছে। সত্যিটা বলে দে। নয়তো তোর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে"।

প্রিয়ম বলল, "আপনার বরের নাম সঞ্জয় দাস? লাল সাদা স্ট্রাইপ পরে ফ্লাইওভারের তলায় চাপা পড়েছে বললেন না?"
অরুন্ধতী নিজের কপালে হাত দিয়ে বসল। উপর মহল থেকে কিছুতেই পারমিশন ছিল না। কাকতালীয়ভাবে ফ্লাইওভারটা ভেঙে পড়ল বলে অত্যন্ত রিস্ক নিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে এই ঝুঁকিটা নিয়েছিল তারা।
ওকে দেখে মনেও হচ্ছে না কিছু করতে পারে। সারাটা রাত অভিনয় করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। ঠিক ছিল প্রিয়মকে বাড়ি থেকে দূরে রেখে মেয়েটাকে খোঁজা হবে।
সারা রাত ওপেন নেট পেয়েও গোল করতে পারে নি সি আই ডির তিন দুঁদে গোয়েন্দা।
অরুন্ধতী বিরক্ত গলায় বলল, "সৌমিক দাস। সঞ্জয় দাস না। সৌমিক। বুঝলি? লাল স্ট্রাইপ দেওয়া জামা! উফফ!"
প্রিয়ম অরুন্ধতীর দিকে মাছের মত চোখে তাকিয়ে রইল।
একজন এসে বলল, "ম্যাডাম। এবার কি তবে?"
অরুন্ধতী বলল, "কোথায় কোথায় দেখেছো?"
"সব ম্যাডাম। বাড়ির পেছনের জমিও খুঁড়েছি। স্যারকে বলে দিন ম্যাম। আমরা বেরিয়ে যাই এবার"।
অরুন্ধতী দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
স্যারকে বলা মানে মারাত্মক ঝাড় খেতে হবে। ছেলেটা কিছুদিন আগে রিহ্যাব থেকে ছাড়া পেয়েছে। শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে...
বাকিরা বাড়ির বাইরে চলে গেল।
অরুন্ধতী উঠে দাঁড়াল। বলল, "সরি"।
প্রিয়ম শুনল নাকি বুঝল না অরুন্ধতী। সে বেরিয়ে গেল।
প্রিয়ম উঠে দরজা বন্ধ করল। অনেক কৌতূহলী মুখ এই ভোরেও উঁকি দিচ্ছে।
আলমারি খোলা। তালা ভেঙে ফেলা হয়েছে।
খাটের তোষক তোলা।
প্রিয়ম কোন মতে বিছানা করে খাটে শুয়ে পড়ল।
সারারাত অনেক ঝক্কি গেছে।
ফ্যানের দিকে তাকাল সে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে এভাবেই ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।
একসময় চোখ বন্ধ হয়ে আসে।
ঘুম আসছে...
তীব্র ঘুম।
প্রিয়ম চোখ বুজল।
দুপুর তিনটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বসল সে।
খিদে পেয়েছে।
হাড়িতে গতরাতের ভাত লেগে আছে। সব ভাত ফেলে হাড়ি পরিষ্কার করে ভাত বসিয়ে দিল।
ঘি ভাত খেতে হবে।
ভাত বসিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে গেল সে। মাটি খোঁড়া হয়েছে।
খানিকটা জংলা জায়গা। পেছনে পাঁচিল।
প্রিয়ম পাঁচিল ডিঙিয়ে হাঁটতে শুরু করল।
বীরুদা বাড়ির সামনে বসে বিড়ি খাচ্ছে।
তাকে দেখে হাসল, "সারারাত ভারি দৌড় করালো বল?"
প্রিয়ম উত্তর না দিয়ে বীরুদার বাড়ি ঢুকে গেল।

বীরুদা বাইরেই রইল।
ঘরের ভেতরে একটা ট্রাঙ্ক রাখা। প্রিয়ম ট্রাঙ্ক খুলল।
স্বাতীর মুখে কাপড় বেঁধে রাখা।
তাকে দেখে ছটফট করতে লাগল।
প্রিয়ম স্বাতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "ফ্লাইওভার চাপা পড়ে মানুষ মারা যায় জানো স্বাতী? তাদের চিনতেও পারা যায় না। আমাকে ভালবাসবে না তো কাকে ভালবাসবে? এন আর আই বর চেয়েছিলে না? সারাজীবন এখানেই থাকো। ট্রাঙ্ক বউ হয়ে"।
স্বাতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।
প্রিয়ম বলল, "ক'টা দিন যাক। আমার কাছেই থাকবে। টিকটিকি লেগেছে তো। এখন একটু কষ্ট কর। আসি, কেমন?"
প্রিয়ম ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।
কত কাজ এখনো।
ভাত নামাতে হবে।
ঘর পরিষ্কার করতে হবে।
বীরুদা নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি খেয়ে যেতে লাগল...

আজ জ্যোৎস্না রাতে

১।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ যযাতি যখন অফিস থেকে বেরোলেন, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। যযাতি আকাশের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কয়েকটা গালাগাল দিয়ে বাস স্ট্যান্ডের শেডে দাঁড়ালেন। উষ্ণায়নের ফলে বিশ্বের কী হাল জানা নেই, তবে বাস স্ট্যান্ডের উত্তাপ খানিকটা বেশি। এক জোড়া তরুণ তরুণী বেশ জোরে জোরে ইংরেজিতে ঝগড়া করে চলেছে। আর কেউ নেই বাস স্ট্যান্ডে।

যযাতি তাকালেন না। সারাক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে মাথা ধরে ছিল, এদের কথোপকথনে মাথা গলালে সে মাথার ভিসুভিয়াস হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। একটা মিনি ছেড়ে দিলেন যযাতি। ওঠা সম্ভব না। মারাত্মক ভিড়।

শহরে বাসের তুলনায় মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেট্রো হচ্ছে, এসি বাস হচ্ছে, ক্যাবের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, তবু রাস্তায় একবার বেরোলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে করে বাড়ি ফেরা এক ঝকমারি।

এই অফিস পাড়ায় বেশিরভাগ লোকের গাড়ি আছে। কেউ অফিসের গাড়িতে যায়। যযাতির অফিসের গাড়ি নেই। বেশিরভাগেরই নিজস্ব গাড়ি আছে।

যযাতি অবশ্য ঠিক করেই রেখেছেন ক্যাব নেবেন না। বাসে ফিরবেন। গাড়ি কেনার টাকা আছে, মাইনেও যথেষ্ট পান। তবু কিনবেন না ঠিক করেছেন। পরিবেশ দূষণে কোনরকমভাবে যোগদান না করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সর্বদা। অফিসেও নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে অকারণ প্রিন্ট আউট নেন না। কাগজ বাঁচানো দরকার।

যযাতি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছেলে এবং মেয়েটির কথা প্রাণপণে কানে না তোলার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে এসে বাংলায় বলল "আংকেল আমাকে আপনার ফোনটা দেবেন একটু? আমার একটা কল করার আছে"।

যযাতি এবারে মেয়েটার দিকে তাকালেন। সতেরো আঠেরো বছর বয়স হবে। লাল রঙের একটা টপ আর জিন্স পরা। ছেলেটা অদূরে দাঁড়িয়ে বেশ ক্ষিপ্ত চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটাকে যযাতি বললেন "আমার কাছে তো ফোন নেই"।

মেয়েটা অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল "সিরিয়াসলি? আপনার কাছে ফোন নেই? আজকালকার যুগে কোন মানুষের কাছে ফোন থাকে না?"

যযাতি বললেন "আমার কাছে থাকে না"।

মেয়েটা নাছোড়, "প্লিজ আংকেল, আমি ভীষণ একটা সমস্যার মধ্যে আছি। আমাকে ফোনটা দিন"।

যযাতি দেখলেন ছেলেটা বেশ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিল। মেয়েটা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল "স্কাউন্ড্রেল", পরক্ষণেই যযাতির দিকে তাকিয়ে বলল "সরি আংকেল। ইটস আ ব্রেক আপ"।

যযাতি বললেন "ওহ। সরি"।

মেয়েটা বলল "আমি টাকা নিয়ে বেরোই নি। দ্যাট স্কাউন্ড্রেল, আমায় ডিচ করেছে জানেন আংকেল। আমার কাছে বাড়ি ফেরার টাকাটুকুও নেই। আমি বুঝতে পারছি ফোন দিতে আপনার কোন প্রবলেম আছে..."

যযাতি এবার হেসে ফেললেন "ট্রাস্ট মি আমার কাছে ফোন নেই। আমি মোবাইল ফোন ইউজ করি না। আপনি চাইলে আমি আপনাকে বাড়ি ফেরার টাকা দিতে পারি"।
মেয়েটা এবার খুশি হল "তাহলে তাই দিন। আমাকে আপনার পেটিএম নাম্বারটা দিয়ে দিন, আমি বাড়ি পৌঁছেই টাকা ফেরত দিয়ে দেব"।
যযাতি বললেন "আমি আপনাকে বললাম আমি ফোন ব্যবহার করি না। পেটিএম কীভাবে ব্যবহার করব?"
মেয়েটা ঠোঁট কামড়ে বলল "বিলিভ মি, আমি ভাবতেই পারছি না, এই সেঞ্চুরিতে এসে কেউ ফোন ব্যবহার করে না। ওকে, আমাকে আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটাই না হয় লিখে দিন, আমি মানি ট্রান্সফার করে দেব"।
যযাতি মাথা নাড়লেন "দ্যাটস বেটার"।
পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে যযাতি মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিলেন।
মেয়েটা বলল "একশো টাকায় কিছু হবে না আংকেল। আমি সেই বেহালা যাব। পাঁচশো টাকা দেওয়া যাবে? ট্রাস্ট মি, আমি টাকা ফেরত দিয়ে দেব"।
যযাতি দ্বিধাগ্রস্থ হলেন। বাস স্ট্যান্ডে দুজন এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে।
এ মেয়ে ফ্রড নয় তো? পোশাক বা চেহারা দেখে কিছুতেই কিছু বোঝা সম্ভব নয় অবশ্য। তবে শহরে ফ্রডের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে পোশাক বা চেহারা দেখে যদি কোন মানুষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করতে হয়। কেউ টাকা নিয়ে দৌড়ে চলে গেলে কিংবা ফোন নিয়ে পালালে কিছু করার উপায় থাকবে না।
যযাতিকে ইতস্তত করতে দেখে মেয়েটা বলল "আপনার কাছে ফোন থাকলে সমস্যাটা হত না বোধ হয়। আপনার বাড়ি থেকে কেউ ফোন করলে আপনি কী করেন? খোঁজ নেয় না? আপনার সম্পর্কে আমার কেমন যেন একটা কৌতূহল হচ্ছে।"
মেয়েটা হঠাৎ করে তার হাত ধরল।
যযাতি ছিটকে সরলেন এক হাত মত। বললেন "কী হচ্ছে?"
মেয়েটা খুব লজ্জিত হল, বলল "সরি সরি, এক্সট্রিমলি সরি আংকেল। আমার খুব ব্যাড হ্যাবিট এটা। চিনি না জানি না, এমন মানুষেরও হাত ধরে ফেলি"।
একটা এয়ারপোর্টের বাস এসে দাঁড়াল। যে দুজন বাস স্ট্যান্ডে ছিল সে দুজন সেটায় উঠে পড়ল। যযাতির অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি বললেন "আপনি দূরে থাকুন। আমার কাছে পাঁচশো টাকা নেই। তবে আর দুশো আছে। নিয়ে যান"।
মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে বলল "ভিক্ষা দিচ্ছেন আংকেল? ভিক্ষা তো চাই নি। আমি তো বলেছি, আপনার টাকাটা আমি ফিরিয়ে দেব"।
যযাতি বুঝলেন কোথাও একটা তাল কাটছে। কপাল ঘামতে শুরু করেছে। এইটুকু বয়সের একটা মেয়ে তার হাত ধরে ফেলল এভাবে? ঘেন্না, পিত্তি কিছুই হল না? বিয়ে হলে এত দিনে এই মেয়েটির বয়সী সন্তান হত তার। একটা বাস এসে দাঁড়াল। তার রুটের বাস না।
তবু যযাতি লাফ দিয়ে প্রচন্ড ভিড় বাসটায় উঠে পড়লেন। হৃদস্পন্দন বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে তার।
বাসটা যখন ছাড়ল, ভিড়ের মধ্যেও যযাতি জানলা দিয়ে উঁকি মারলেন। মেয়েটা কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে চোখে চোখ পড়ায় যেন এক রাশ প্রশ্ন। বলতে চাইছে 'কী হল?'
যযাতি আবার দ্বিধায় পড়লেন। তিনি কি উল্টোপালটা ভেবে ফেলছিলেন আসলে? সত্যিই কি মেয়েটার কোন উদ্দেশ্য ছিল না? ঘামতে ঘামতে এবং পকেট বাঁচাতে বাঁচাতে তার লজ্জা হল। মেয়েটা একা আছে। সত্যিই তো! বাড়ি ফিরবে কী করে? অজানা অচেনা লোকের কাছে টাকা চাইলে যদি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নেয়? বাস স্ট্যান্ডটাও সুবিধের জায়গায় নয়। খুব বেশি লোকজন থাকে না। মেয়েটা বলল ব্রেক আপ হয়েছে। ছেলেটাও যদি কোন ভাবে মেয়েটার ক্ষতি করতে চলে আসে?

কাজটা মনে হয় ঠিক হল না ভাবতে ভাবতে যযাতি বিশ্বাস জীবনেও যেটা কোন দিন করেন না, সেটা করলেন। পরের স্টপেজেই নেমে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আগের বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিলেন।

২।

যযাতি বুঝে উঠতে পারছেন না মেয়েটা ঠিক কী চায়।

প্রজন্মের পার্থক্য দিন দিন বেড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আমরা নতুন যৌবনের দূত"।

এই লাইনটার সংজ্ঞা প্রতিটা যুগে একটু একটু করে পাল্টেছে। তাদের যৌবনে তারা যেভাবে পৃথিবীটা দেখেছিলেন, এই প্রজন্ম সেভাবে দেখে না। শরীর নিয়ে ছুতমার্গও এদের কম। নইলে যেভাবে হঠাৎ করে মেয়েটা তার হাত ধরে ফেলল, তাদের প্রজন্মে এটা সম্ভব ছিল না। এদের বুঝে ওঠা অত সহজ নয়। দুরকম ব্যাপারই হতে পারে। হতে পারে মেয়েটা সরলভাবেই তার হাত ধরেছে। অন্যদিকে হতে পারে, ভেবে নিয়েছে তার মত একজন মধ্যবয়স্ক লোক, কমবয়সী মেয়ের স্পর্শ পেয়ে টাকা বের করে দেবে। অনেক কিছুই হতে পারে। যযাতি আর বেশি ভাবতে পারলেন না। ট্যাক্সিটা বাস স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছলে যযাতি দেখলেন মেয়েটা তখনও একা একাই দাঁড়িয়ে আছে।

ট্যাক্সি থেকে যযাতি নামতেই মেয়েটা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল "আরে আংকেল আপনি চলে গেছিলেন কেন?"

যযাতি ইতস্তত করে বললেন "বাসটা দেখে রিফ্লেক্স একশন হল আর কী। তারপর মনে হল আপনাকে টাকাটা না দিয়ে গেলে আপনি অসুবিধেয় পড়তে পারেন। আপনি এই ট্যাক্সিটা করে চলে যেতে পারেন। আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি"।

মেয়েটা বলল "ওরে বাবা, এটা তো ইয়েলো ট্যাক্সি, এদের জিপিএসও নেই। খুব রিস্ক হয়ে যাবে"।

যযাতি শ্বাস ছেড়ে বললেন "ঠিক আছে, উঠুন। আমি যাচ্ছি"।

মেয়েটা খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলল "থ্যাংক ইউ। আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। আপনার মধ্যে বেশ একটা পারসোনিলিটি আছে"।

মেয়েটা ট্যাক্সিতে উঠল। যযাতিও উঠলেন। মেয়েটার কথায় হাসবেন, না কাঁদবেন বুঝলেন না। তার মধ্যে পারসোনালিটি দেখে ফেলল এ!

ট্যাক্সিচালককে বললেন "বেহালা"।

ড্রাইভার বেঁকে বসল "ওদিকে তো যাব না"।

যযাতি বিরক্ত গলায় বললেন "এখন আমি কোত্থেকে আর অন্য কোন গাড়ি পাব? চলুন, এক্সট্রা টাকা দেব না হয়"।

ড্রাইভার গজগজ করতে করতে গাড়ি স্টার্ট দিল।

মেয়েটা বলল "হতে পারে আপনি স্মার্ট ফোন ইউজ করেন না, বাট ইউ আর এ রেসপন্সিবল সিটিজেন। একজন মেয়েকে একা ফেলে চলে গিয়ে আপনার মনে অপরাধবোধ জেগেছে। অথচ দেখুন, আমি যে ছেলেটাকে ভালবাসতাম, সে জানোয়ারটা আমাকে কীভাবে একা ফেলে চলে গেল। ওর জন্য আমি বাড়িতে মিথ্যে বলে এতটা চলে এসেছিলাম"।

যযাতি বললেন "আপনার বাড়িতে চিন্তা করছে নিশ্চয়ই। কোন পিসিওতে দাঁড় করাতে বলব?"

মেয়েটা হাত নেড়ে বলল "তার দরকার নেই। চলে যাচ্ছি তো। কোথাও আটকে গেলে দেখা যেত। সব লোকের কাছে তো আর ফোন চাওয়া যায় না, তাছাড়া বাস স্ট্যান্ডটাও এমন জায়গায়, লোকই আসে না তেমন। সব মিলিয়ে এরকম পরিস্থিতি তো সব সময় হয় না..."

মেয়েটা একগাদা বক বক করে যেতে লাগল।

যযাতি চোখ বুজলেন।
একটা ফোন গোটা সভ্যতাকে পালটে দিয়েছে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগেও তো মোবাইল সেভাবে ব্যবহৃত হত না। সে সময়টাতে তো এরকম দশা ছিল না! অথচ আজকাল একটা ফোন না পেলে বাড়ির লোক চিন্তায় মরে। সর্বক্ষণ মানুষ ডুবে আছে যন্ত্রটায়।
নিজে ফোন ইউজ করেন না বলেই দেখতে পান পাবলিক ট্রান্সপোর্টে প্রতিটা মানুষ ফোনে মুখ গুঁজে বসে আছে। এ এক অদ্ভুত মহামারী, ছড়িয়ে পড়ছে সেকেন্ডে সেকেন্ডে।
কিছুটা পথ গিয়েই ট্যাক্সিটা আটকে গেল। ভয়াবহ জ্যাম। গিজগিজ করছে গাড়ি। যযাতি অবাক হয়ে ড্রাইভারকে বললেন "কী হল আবার?"
ড্রাইভার উত্তর না দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল।
“মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সব থেকে বড় সমস্যা হল, আমরা আমাদের স্মৃতিশক্তিটাকেই ফোনকে সমর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি। অথচ আমার প্রায় সবার নম্বর মুখস্থ থাকে”।
কথাগুলো অস্ফূটে বলে চুপ করে গেলেন যযাতি।
মেয়েটা বলল “অথচ আপনার নিজের কাছেই ফোন থাকে না। ফোন নাম্বার মুখস্থ করে কী লাভ হয়?”
যযাতি বললেন “অফিসে ল্যান্ডলাইন আছে। আমার বাড়িতেও। প্রয়োজনে সেখান থেকে করি”।
মেয়েটা মুগ্ধ চোখে যযাতির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল “আপনি সংরক্ষণযোগ্য। এখনো পৃথিবীর লোক আপনার দেখা পায় নি কেন? আপনাকে নিয়ে টিভি শো হওয়া উচিত”।
বাইরে উত্তেজনা বাড়ছে। তাদের ট্যাক্সির বাইরে একটা ভিড়ে গিজগিজে বাসে লোকজন তবু কেমন নির্লিপ্ত। এ দেশের সাধারন মানুষ। এদের নির্লিপ্ততা অভ্যাস করতে হয় না। প্রকৃতিতে ঢুকে যায়। জনবিস্ফোরণের ফলে জনের গুরুত্ব কমে যায় কি? যযাতি চিন্তিত হলেন। প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন একটা তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলোর সুবিধে অসুবিধে নিয়ে।
প্রতিদিন মানিব্যাগ বাঁচিয়ে বাসে যেতে যেতে তৃতীয় বিশ্বের দেশের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবেন। একসময় কাগজে দেখলেন উত্তর সম্পাদকীয়তে প্রবন্ধ পাঠানো যায়। যযাতি ঠিক করলেন এই বিষয়েই কিছু লিখবেন। শুধু পড়লেই তো হবে না। বাস্তবটা নিজের চোখে দেখতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন আছে ঠিকই,তার থেকেও বেশি প্রয়োজন আছে সমস্যাগুলোকে নিজের চোখে দেখার, নিজের কানে শোনার, নিজ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার। একটা সময় লিখতেন। লিখতে ভাললাগত বলেই লিখতেন। পরে লেখা বন্ধই করে দিলেন। বহু বছর বন্ধ ছিল। এক বছর হল আবার লিখতে শুরু করেছেন। আগে লিখতে বসলে শব্দের অভাব হত না। আজকাল হয়। শব্দগুলো পালিয়ে বেড়ায়। ভাষা খুঁজে পান না। তখন ভীষণ অসহায় মনে হয়। লেখা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। নিজের ওপরেই প্রবল রাগ তৈরী হয়।
যযাতি আরও কিছু ভাববেন বলে ভাবছিলেন, এমন সময় মেয়েটা বলে উঠল “আপনি ঠিক কবে থেকে গুহামানব হবেন?”
যযাতি অবাক হয়ে বললেন “মানে?”
মেয়েটা বলল “মানে এভাবে মোবাইলহীন জীবন কাটাবেন?”
যযাতি বললেন “মোবাইলহীন জীবনের সঙ্গে গুহামানব হবার কোন সম্পর্ক নেই। মোবাইল তারা ব্যবহার করে, যাদের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন পড়ে। আমায় অফিসের বাইরে কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় না”।
মেয়েটা বলল “ইন্টারেস্টিং। ইউটিউব ভিডিও, গান শোনা, সিরিজ দেখা এটসেট্রা, এটসেট্রা করেন না? টিভি দেখেন না?”
যযাতি মাথা নাড়লেন “না”।
মেয়েটা হাঁ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল “তাহলে কী করেন?”

যযাতি বললেন “বই পড়ি”।
মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল “তাহলে খুব ভাল। আমার বাবাও পড়তে খুব ভালবাসে। আই মিন, আমার নিজের বাবা না, আমাকে যে বড় করেছেন, সেই বাবা”।
যযাতি বললেন “বুঝলাম না। আপনার নিজের বাবা নেই?”
মেয়েটা বলল “আছে। তবে থাকে না এখানে। ছোট থেকে বেশি দেখি নি। ইদানীং আসে। আমার কথা মনে পড়ে নাকি। এসে এক গাদা জ্ঞান দেবে। কে শুনবে ওর জ্ঞানের কথা? যখন থাকার দরকার ছিল তখন তো থাকে নি”।
মুখ বাঁকাল মেয়েটা। যযাতির খারাপ লাগল। যেসব মানুষের শৈশব ডিস্টার্বড হয়ে যায়, তাদের জীবন বড় কষ্টকর হয়। অভাব ছিল তার জীবনেও। টাকার অভাব। অভাব মানুষকে এমন সব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করায়, স্বাভাবিক অবস্থায় হয়ত মানুষ কিছুতেই সে সব সিদ্ধান্ত নিত না। মেয়েটার ক্রাইসিস যদি ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়, তাহলে মেয়েটার জন্য খারাপ লাগা আসতে বাধ্য।
ট্যাক্সির কাঁচ নামানোই ছিল। মানুষের হৈ হৈ শোনা যাচ্ছে। যযাতি বুঝলেন না কী ব্যাপার। মিটিং মিছিল হচ্ছে? কোন রাজনৈতিক দলের মিছিলে ঝামেলা হচ্ছে কি? নেমে দেখাই যায়, যযাতির ইচ্ছা করছিল না শরীর এক অদ্ভুত বস্তু। যখন হাঁটার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তখন মাইলের পর মাইল হাঁটলেও কোন সমস্যা হয় না। যখন ট্যাক্সির আরাম পায়, তখন আর নামতে ইচ্ছা করে না।
ঝামেলার কারণ জানা যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।
ট্যাক্সির ড্রাইভার এসে বলল "ব্রিজ ভেঙে পড়েছে স্যার”।
যযাতি অবাক হয়ে বললেন, “হোয়াট?”
ড্রাইভার বলল, “ফ্লাইওভার স্যার, যেটা তৈরী হচ্ছিল। ভেঙে পড়েছে”!
যযাতি হাঁ করে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না। এটাও সম্ভব নাকি?
মেয়েটা বলল "শিট। যেই ভাবলাম ড্রাইভার কাকুর ফোন থেকে বাড়িতে ফোন করে জানাব, আমার বাবা আর মা, কারো নাম্বারই মনে পড়ছে না। আমার কিছুতেই ফোন বুক ছাড়া কারো নাম্বার মনে থাকে না। এবার কী হবে?"
যযাতি চমকে উঠে মেয়েটার দিকে তাকালেন।
খুব জোরে হইচইয়ের আওয়াজ আসছে। যযাতি এবার চিন্তায় পড়লেন। গাড়িটা ব্যাক করার জায়গাও নেই। পুলিশের গাড়ির শব্দ আসছে। ট্যাক্সিচালক দৌড়ে ট্যাক্সিতে উঠে বলল “পুলিশ এসেছে। এবার শিওর লাঠি চার্জ হবে”।

৩।
অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে বেরনোর পর বিম্বিসার এফ এম চালিয়ে দেখলেন চ্যানেলগুলো একটাও বাংলা গান বাজাচ্ছে না। বিরক্ত মুখে তিনি এফ এমটা বন্ধ করে দিলেন। হিন্দি ভাষার উপরে বিম্বিসারের বিন্দুমাত্র কোন রাগ নেই, তবে বাংলায় থেকে অন্তত একটা কেউ তো বাংলা গান চালাবে! কয়েকজন রেডিও জকি বাদে বাকি যারা আছে, তারা ভাঁড় ছাড়া কিছু না। যেন জোর করে হাসাবে। তার ওপর গানের থেকে বিজ্ঞাপন বেশি। কতগুলো পাঞ্জাবী গান, সারাদিন ধরে লুপে বেজে চলেছে। এত ভাল ভাল বাংলা গান থাকতে কলকাতার এফ এম চ্যানেলগুলো এই গান বাজায় কেন সারাক্ষণ? পাঞ্জাবী গান এত জনপ্রিয় হয়ে গেছে? অদ্ভুত সব সেক্সিস্ট গান, নইলে পুরনো গানের অর্থহীন রিমিক্স। এ গানগুলো শুনতে না চাইলেও সারাদিন শুনিয়ে শুনিয়ে এদের ট্রেন্ডিং করে তোলাই কাজ এদের।
রাস্তায় ভয়াবহ জ্যাম। বিম্বিসার চুপ করে বসে ছিলেন। গাড়ি এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না। শহরের ভার বাড়ছে প্রতিদিন। এসি চলছে বলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করেন নি।

ফোন বাজছে। বিম্বিসার দেখল বিভাবরী ফোন করছেন। ধরলেন “বল”।
বিভাবরী বললেন “তুমি কোথায়?”
বিম্বিসার বলল “তপসিয়া। জ্যাম আছে। আরো একঘন্টা ধরে রাখো”।
বিভাবরী একটু চুপ করে বললেন “সুপ্রিয় এসেছে”।
বিম্বিসার থমকে গেলেন। বললেন “কখন?”
বিভাবরী বললেন “একটু আগে। ড্রয়িং রুমে বসিয়ে এলাম। তাতানকে দেখতে চাইছে”।
বিম্বিসার বললেন “তাতান কোথায়?”
বিভাবরী বললেন, “কলেজ গেছিল, তারপর টিউশনে আছে। ফিরবে খানিকক্ষণ বাদে। তুমি কোনভাবে তাড়াতাড়ি এসো। সুপ্রিয় আবার কী সব বলবে তাতানকে, আবার সীন ক্রিয়েট হবে, আমি কেমন নার্ভাস ফিল করছি”।
এসি চলা সত্ত্বেও বিম্বিসারের ঘাম হতে শুরু করেছে বুঝলেন তিনি। এসির তাপমাত্রা আরো কমিয়ে বিম্বিসার বললেন “চেষ্টা করছি আসার। তুমি স্বাভাবিক থাকো। আরেকটা কাজ করতে পারো, তাতান যে বাড়ি পড়তে গেছে, সেখানে ফোন করে বল আমি ওকে যাবার সময় নিয়ে যাব। আপাতত তাতান যেন ওখানেই থাকে”।
বিভাবরী বললেন “আর আমি এখানে এতক্ষণ সুপ্রিয়কে নিয়ে একা বাড়িতে থাকব? তাতানকে নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করবে আর আমাকে উত্তর দিয়ে যেতে হবে?”
বিম্বিসার বললেন “তুমি ভেতরের ঘরে থাকো। ওকে চা পাঠাও। টিভি চালিয়ে দাও। বসে থাকুক”।
বিভাবরী একটু ভেবে বললেন , “ঠিক আছে। তুমি দেরী কোর না। চলে এসো শিগগিরি”।
ফোনটা কেটে দিলেন বিভাবরী। গাড়ি এগনো শুরু হয়েছে পার্ক সার্কাসের দিকে। বিম্বিসার বুঝতে পারছিলেন তার প্রেশার চড়ছে। সুপ্রিয়কে এখনই আসতে হবে? তাতান যখন ছোট ছিল তখন তো এত আসত না! বড় হলেই পিতৃত্ব ফলাতে আসতে হবে! মুখের ভিতরটা তেতো হচ্ছিল তার। তৃণা মারা যাবার পর থেকে তিনি আর বিভাবরীই তাতানকে বড় করলেন। সে সময়টা একেবারেই আসেন নি সুপ্রিয়। এদিক সেদিক ঘুরে বেরিয়েছেন। এক টাকাও পাঠান নি। বিম্বিসার সেসব চানও নি কোনদিন। নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান কাছে আশীর্বাদস্বরূপ এসেছিল তাতান। এখনও তাতান সুপ্রিয়কে খুব একটা পছন্দ করে না। সুপ্রিয় এলে মেয়ে দেখাও করতে চায় না।
সুপ্রিয় এখন হিমাচল প্রদেশে থাকেন। অথচ মাঝে মাঝেই মেয়েকে দেখতে চলে আসছেন। এত দূর থেকে বারবার সব কাজ ফেলে আসছেন। বিম্বিসারের ভাল লাগছিল না। জীবন এত জটিল হবে কেন? তৃণা মারা যাবার পর সুপ্রিয় পাগল পাগল হয়ে গেছিলেন। রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। বিম্বিসার আর বিভাবরী তাতান ছাড়া কিছু বোঝেন নি।
এখন হঠাৎ করে সুপ্রিয় এসে জটিলতা বাড়িয়ে যাচ্ছেন। এর আগের বারে এসে দুম করে তাতানের সামনেই বলে বসলেন মেয়েকে এত স্বাধীনতা দিয়ে ঠিক করছে না তারা। সন্ধ্যেবেলার মধ্যে ঘরে ফেরাটা রেগুলার মণিটরিং করে যেন বিভাবরী।
তখন কিছু বলেন নি বিভাবরী, কিন্তু পরে বিম্বিসারের সামনে কেঁদে ফেলেছিলেন। এখন এসব জ্ঞান দেওয়ার মানে কী? মেয়ের বয়ঃসন্ধি থেকে শুরু করে সবটা তো তারাই সামলালেন। এখন বাপগিরি করছে কেন? দখলদারি ফলাতে চাইছে? কী হাস্যকর!
তাতানও সুপ্রিয়কে পছন্দ করে না। তবু বাবা বলে কথা। তারাই বুঝিয়ে শুনিয়ে সুপ্রিয়র সঙ্গে তাতানের কথা বলায়।
গাড়ি আবার জ্যামে পড়েছে।
ফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে। বিভাবরীই, ধরলেন বিম্বিসার “বল”।

"তাতানের ফোন পাচ্ছি না। সুইচড অফ বলছে। টিউশনের ওখানে ফোন করে জানলাম আজ যায় নি। কী করব এবার?"
বিভাবরীর কথাটা আর্তনাদের মত শোনাল।

৪।
"আমার মেয়ে কোথায় বিভা?"
বিভাবরী ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই প্রশ্নটা করলেন সুপ্রিয়। বিভাবরী টিভির দিকে তাকালেন।
শহরে একটা একটা উড়ালপুল ভেঙে পড়েছে। খবরে বার বার দেখাচ্ছে।
সুপ্রিয় কেমন একটা তেড়িয়া ভঙ্গিতে বসে আছেন।
বিভাবরীর কান্না পাচ্ছিল। সামনে সুপ্রিয়। তিনি কীভাবে একা সব কিছু সামলাবেন? ওই দুজন কখন ফিরবে সেটা তো সুপ্রিয়র সঙ্গেও আলোচনা করা যাবে না! আরেক ঝামেলা লাগবে।
তিনি বললেন "তাতান শুধু তোমার মেয়ে সুপ্রিয়?"
প্রশ্নটা শুনে সুপ্রিয় কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি এমনি এমনি এত দূর থেকে এখানে ছুটে আসি না বিভা। আমি গুরগাও যাচ্ছিলাম গত বছর। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে হালকা হতে নেমেছি, দেখি একটা লাশ। চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ের। জামা কাপড় নেই। আমার মনে হচ্ছিল হৃদপিণ্ডটা বেরিয়ে আসবে। মনে হচ্ছিল, লাশটা তাতানের। তারপর থেকে আমি ঘুমাতে পারি না, বিশ্বাস কর। আমাকে হন্ট করে লাশটা। চোখ বুজলেই আমি মেয়েটাকে দেখতে পাই"।
সুপ্রিয় দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিলেন।
বিভাবরী চুপ করে বসলেন। তার নিজেরও প্রবল অস্বস্তি হচ্ছিল টিভির দিকে তাকালেই। তিনি বললেন, "এ শহরটা তো গুরগাও না সুপ্রিয়। এত ভয় পেও না"।
সুপ্রিয় ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে হাসলেন, "হাহ... এই শহর। তুমি বলছ এই শহর। পৃথিবীর কোন শহর মেয়েদের জন্য সেফ বল তো? মেয়েদের কেউ মানুষ বলে ভাবে নাকি?"
ভয়ংকর ভাবে একটা ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছে। তার ভেতরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। তাতানকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল ও? ছেলেটার সঙ্গে আছে কি? নাকি...
নি। মেয়ের ওপর তার ভরসা আছে। জানেন, তাতান ঠিক পথেই আছে। কিন্তু মেয়েটা এখন ছেলেটার সঙ্গে থাকে যদি তাহলে ঠিক কী অবস্থায় আছে?
তিনি বললেন, "সন্তানের মা কি শুধু জন্ম দিলেই হওয়া যায় সুপ্রিয়? আমি কী অবস্থায় আছি সেটা বুঝতে পারছো? একটু অপেক্ষা কর না হয়"।
সুপ্রিয় অস্থির ভাবে মাথা নাড়লেন "করছি। অপেক্ষাই তো করছি। কীভাবে মেয়েটাকে দূরে ঠেলে দিয়েছি বলো? তোমরা না থাকলে যে কী হত! কতটা স্বার্থপর একটা জীবন কাটালাম। নিজের ওপরেই ঘেন্না হয়। মনে হয় নিজের গালে নিজেই চড় মারি। তবু বুঝতে চাই না। আমি থাকতে পারি না আর এত দূরে। সারাক্ষণ মনে হয় তাতানকে দেখি। মেয়েটা কী করছে, কত বড় হয়ে গেল আমার অলক্ষ্যেই। অথচ আমি বাবার কর্তব্য কিচ্ছু পালন করলাম না"।
সুপ্রিয় মাথায় হাত দিলেন।
বিভাবরী বললেন, "এভাবে ভেবো না আর। কী করবে বল? একটাই তো জীবন। যা হয়ে গেছে, সেটাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তুমি এখন মাথা ঠান্ডা কর। নিজের শরীরটা খারাপ কোর না। তাতান আমাদের সবার মেয়ে। কিচ্ছু হবে না ওর"।
সুপ্রিয় বললেন "জানি। কিচ্ছু হবে না জানি। আমার ছুটি ছিল না। আমি দিল্লিতে একটা কাজে গেছিলাম। কী মনে হতে একগাদা টাকা খরচ করে কলকাতা চলে এলাম। কাল ভোরে চলে যাব। শুধু তাতানকে একটিবার

দেখতে এসেছি। তোমরা ভেবো না, তাতানকে আমি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে আসি না। রক্ত তো...” সুপ্রিয় কেঁদে ফেললেন।

টিভিতে ভয়াবহ সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছে কীভাবে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারটা ভেঙে পড়ল। ফ্লাইওভারের তলায় একটা পানের দোকান ছিল। দশ বারোজন আড্ডা মারছিল সেখানে। এখন তার কোন চিহ্ন নেই।

বিভাবরী উঠলেন। বিম্বিসারকে ফোন করতে হবে। বার বার ফোন করলে লোকটা বিরক্ত হবে ঠিকই, কিন্তু তিনি কী করবেন? চিন্তাটা তো আর আটকানো যাবে না!

সুপ্রিয় একা একা বসে থাকলেন। একজন হেরে যাওয়া মানুষ যেভাবে বসে থাকে।

৫।

ব্যারিকেড করা চলছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে ট্যাক্সিতে বসে বলল, “পুরো ফেঁসে গেলাম। এক কাজ করুন। আপনারা নেমে যান। হাঁটতে শুরু করুন। কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন। ঘুর পথ হবে, তবে বাড়ি পৌঁছে যাবেন। সামনের দিকটা কবে ঠিক হবে, কেউ জানে না। লোকে সেলফি তুলছিল ভাঙা ব্রিজের সঙ্গে, দিয়েছে পুলিশ লাঠি ঠুসে”।

খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল ট্যাক্সিচালক।

যযাতি ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামলেন। মেয়েটা বলল, “এবার হাঁটতে হবে? আমার হাঁটায় খুব অ্যালার্জি”।

বাসগুলো থেকে লোকজন নেমে হাঁটতে শুরু করেছে। আরেকদল ভাঙা ফ্লাইওভার দেখতে যাচ্ছে। যযাতি ওদিকে তাকালেন না। ভাবতেও অস্বস্তি হচ্ছে।

মেয়েটাকে বললেন, “আপনি যে কোন একটা নাম্বার মনে করার চেষ্টা করুন। সিচুয়েশনটা ঘোরালো হচ্ছে”।

মেয়েটা বলল, “আমাকে আপনি তাতান বলে ডাকুন। ডাকনাম এটা। আর তুমি বলুন”।

যযাতি বললেন, “ঠিক আছে। তুমি বাড়ির যে কোন কারো নাম্বার মনে করার চেষ্টা কর। এখান থেকে বেহালা যাওয়াটা এখন আর অত সহজ নেই। যে কোন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে”।

তাতান বলল, “বিলিভ মি আংকেল। আমি কোন নাম্বার মুখস্ত রাখি না”।

যযাতি বললেন, “ঠিক আছে। হাঁটো। দেখি কোন গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় নাকি। এদিকে তোমার কোন আত্মীয় স্বজন থাকেন না?”

তাতান মাথা নাড়ল, “নাহ। থাকলেও এদিকে আমি কাউকে চিনি না”।

যযাতির হাঁটার অভ্যাস আছে। সমস্যা হল গাড়ি, ভিড়, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ভেতরে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল।

তাতান বলল, “কী স্যাড না?”

যযাতি বললেন, “কোনটা?”

তাতান বলল, “এই যে, কত মানুষ মরে যাবে। ফ্লাইওভারটা তো আমাদের ট্যাক্সির ওপরেও পড়তে পারতো আর কিছুক্ষণ পরে এলে”!

যযাতি বললেন, “পারত। ঠিকই”।

তাতান হাসল, “আমারই ভুল ছিল। মার কথা শোনা উচিত ছিল। সব ছেলেকে বিশ্বাস করা যায় না। এত দূর আসা ঠিক হয় নি। পৃথ্বীকে বিশ্বাস করা আরো উচিত হয় নি। রক মিউজিক শুনলে আর ড্রাগস নিলেই কুল হওয়া যায় না। আমি কেন বুঝি নি?”

যযাতি শ্বাস ছাড়লেন, “সেটা আমি কী করে বলব?”

তাতান বলল, “ঠিকই তো। আপনি কী করে বলবেন? আপনি একটা ওল্ড জেনারেশনের লোক। আপনি বুঝবেন না”।

যযাতি বললেন, "তা ঠিক। সত্যিই আমি ওল্ড জেনারেশনের লোক"।
তাতান বলল, "আপনার ছেলে মেয়ের অশেষ দুর্গতি আছে। ফোন কিনতে আসবে, আপনি গম্ভীর গলায় বলবেন, ফোন ইউজ করবে না। বই পড়"।
চারদিকে তুমুল ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তাতান হাসতে লাগল। কেউ বিরক্তি, কেউ কৌতুক মাখানো দৃষ্টি নিয়ে তাতানের দিকে তাকাচ্ছে।
যযাতিও হাসলেন। ফায়ার ব্রিগেড আটকে গেছে। অ্যাম্বুলেন্সও। পুলিশ হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা খালি করতে পারবে। অপেক্ষা করা কি ভাল হবে? না বোধ হয়। বরং জায়গাটা থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই ভাল। কখন কী থেকে কী হয়ে যায়, বোঝা সম্ভব না।
সভ্যতা যত এগোবে, তত এ ধরণের জঞ্জাল বাড়বে।
সঙ্কীর্ণ রাস্তা, কংক্রিটের জঙ্গল, তার মধ্যেই ফ্লাইওভার তৈরী হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসে মাঝে মাঝে।
যযাতি খরচ বাঁচিয়ে গ্রামের দিকে জমি কেনার কথা ভেবেছেন বহু দিন। এসব দেখে প্রতিজ্ঞা করলেন, এক মাসের মধ্যে শহর ছাড়তে হবে। এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। শহরটা আর বাসযোগ্য নেই।
চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হবে। যে টাকা জমেছে, সে টাকা দিয়ে বাকি জীবনটা কেটে যাবে।
তাতান বলল, "আর কত হাঁটব?"
যযাতি বললেন, "তোমার বাড়ির কোন নাম্বারই মনে পড়ছে না?"
তাতান বলল, "একটা ল্যান্ডলাইন ছিল। সেটা তো ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে বহুদিন। এই সব ফোন আসার পরেই। ওটার নাম্বার মনে আছে"।
রাস্তার বাঁক পেরিয়ে যযাতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শহরের সব গাড়ির কি আজকে এদিকেই আসার ছিল?
তাতান ফুটপাথে বসে পড়ল, "আমি আর পারছি না"।
যযাতি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।
ঠিকই, শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার চিন্তা করা যাচ্ছে না এখন।
সড়কপথে গেলে কখন বেহালা পৌঁছে নিজের বাড়ি পৌঁছবেন চিন্তা করা যাচ্ছে না।
একটাই উপায় এখন। কাছাকাছি কোন মেট্রো স্টেশনে পৌঁছতে হবে!
এ ছাড়া আর কোন রাস্তা অবশিষ্ট নেই।

৬।

রাস্তার সমস্যা হল, একটা লাল সিগনাল এলে পর পর আসতে শুরু করে। বিম্বিসার যত তাড়াতাড়ি ড্রাইভ করার চেষ্টা করছেন, ততবার সিগনালের সামনে পড়ে যাচ্ছেন।
সুপ্রিয় এলে বিম্বিসারের মাথা ঠিক থাকে না। তখন মনে হয় তাতানকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই হয়। সুপ্রিয়র অধিকার ফলানো দিন দিন অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিয়র কঠিন সময়ে তারা পাশে ছিলেন। এখন ওর বোঝা উচিত, তাদের পরিবারে এভাবে ঢুকলেও আসলে তিনি আউটসাইডার হয়ে গেছেন। তিনি যেমন নিজের মেয়েকে ভালবাসেন, বিম্বিসার-বিভাবরীও তার থেকে বিন্দুমাত্র কম ভালবাসেন না।
অফিস টাইমের জ্যামের মহাসমুদ্র পেরিয়ে বাড়ি ঢুকলেন তিনি। কীভাবে গাড়ি চালিয়ে এলেন, তিনিই জানেন। একটা বাইক গাড়ির পিছনটা ঘষে দিয়েছে। অন্য দিন হলে ক্ষতিপূরণ নিতে দাঁড়ালেন। এদিন সেটার কথা ভাবতেও পারলেন না। তড়ি ঘড়ি চালিয়ে এলেন। কত জায়গায় স্পিড লিমিট ক্রস করে গেছেন। নিশ্চয়ই কেস দেবে। দিলে দেবে। আবার সুপ্রিয়র মুখ দেখতে হবে ভাবলেই বিরক্ত লাগছিল।
বিভাবরী কাঁদো কাঁদো মুখে দরজা খুললেন।
বিম্বিসার বললেন, "তাতান ফেরে নি?"
বিভাবরী মাথা নাড়লেন, "দেখো না, ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছে বলছে। মেয়েটা যদি ওখানে থাকে!"

বিম্বিসার ভ্রূ কুঁচকালেন, "ওখানে কেন থাকতে যাবে? ওটা তো উল্টোদিক"।
বিভাবরী ফিসফিস করে বললেন, "তোমাকে বলি নি। ওর একটা ছেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার চলছে। টিউশন বাঙ্ক করে যদি ওদিকে যায়? আমার তখন থেকে মাথা কাজ করছে না"।
বিম্বিসার স্থির চোখে বিভাবরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চল। এখনই চল"।
বিম্বিসার এরকমই। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিতে পারেন।
বিভাবরী বিস্মিত হয়ে বললেন, "কোথায় যাব?"
বিম্বিসার বললেন, "যেখানে ফ্লাইওভার ভেঙেছে। আমি এখন কী করে ঘরে বসে থাকব? সেটা সম্ভব?"
বিভাবরী বললেন, "আর সুপ্রিয়?
বিম্বিসার বললেন, "নিয়ে চল। সুপ্রিয়"!
গলা তুললেন বিম্বিসার।
সুপ্রিয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।
বললেন, "তুই এলি? তাতান এল না কেন এখনো?"
বিম্বিসার একবার বিভাবরীর দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়র দিকে তাকালেন, "চল। বেরোতে হবে"।
সুপ্রিয় বললেন, "বেরোতে হবে মানে? কোথায় যেতে হবে? আমার মেয়েটা বেঁচে আছে তো রে?"
বিম্বিসার বললেন, "জন্ম দিলেই মেয়েটা তোর হয়ে যায় না। তাতান আমাদেরও মেয়ে"।
সুপ্রিয় বিম্বিসারের হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেললেন, "কী হয়েছে বল প্লিজ। টিভিতে খবরগুলো দেখে মাথা ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তাতান ঠিক আছে তো?"
বিম্বিসার বললেন, "তাতান পড়তে গেছিল। তারপর ওর ফোন সুইচড অফ বলছে। লো ব্যাটারি মে বি। যেখানে ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছে, সেদিকে গেছে নাকি জানি না। তবে এখনো ফেরে নি। খোঁজ করতে হবে। আপাতত বেরোতে হবে। ঘরে বসে কোন লাভ নেই। চল"।
সুপ্রিয় চিৎকার করলেন, "কেন? তাতানকে তোরা কেন ঠিক মত শাসন করিস নি? কেন ও নিজের ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়াবে?"
বিম্বিসার প্রাণপণে নিজের মাথা ঠান্ডা রেখে যাচ্ছিলেন। বললেন, "তাতান এখন আর দু বছরের বাচ্চা নয়। আজকালকার জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের হাতে পায়ে বেড়ি বেঁধে শাসন করা সম্ভব নয়। এখানে কথা বলে, চিৎকার চ্যাঁচামেচি না করে চল। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করতে হবে"।
সুপ্রিয় বিম্বিসারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে, "ওহ" বলে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগারেট বের করে ধরালেন।
বিভাবরী তালা চাবি নিয়ে এলেন। তার হাত পা কাঁপছিল।
বিম্বিসার বিভাবরীর হাত থেকে তালা চাবি নিয়ে গেট বন্ধ করে বললেন, "পাশের মিত্রদার বাড়িতে চাবি দিয়ে এসো। ওদের বলে দাও, এর মধ্যে তাতান ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের ফোন করে জানায়। বেশি কিছু বলতে হবে না। তাহলে অযথা কৌতূহল দেখাতে শুরু করবে"।
গেটে চাবি দিয়ে বিম্বিসার বিভাবরীর হাতে চাবি দিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন।
সুপ্রিয় সিগারেট টেনে যাচ্ছিলেন।
বিম্বিসারকে গাড়িতে গিয়ে বসতে দেখে তিনি সিগারেট ফেলে বিম্বিসারের পাশের সিটে বসলেন।
বিম্বিসারের মাথা দপ দপ করছে। তাতানকে নিয়ে এমনিতেই সব সময় চিন্তায় থাকতে হয়, সুপ্রিয়র উপস্থিতিটা তাকে অপরাধী বানিয়ে দিচ্ছে। বিভাবরী পাশের বাড়ির মহিলার সঙ্গে কথা বলেই চলেছেন।
বিরক্ত হয়ে বিম্বিসার দুবার হর্ন দিলেন।
বিভাবরী তাড়াতাড়ি এসে গাড়ির পিছনের সিটে বসলেন।
বিম্বিসার গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

সুপ্রিয় বললেন, "থানা যাওয়া ভাল না হাসপাতালে? বেঁচে আছে তো?"
বিম্বিসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, "কী বললি?"
সুপ্রিয় থতমত হয়ে বললেন, "কিছু না। কিছু না। চল। প্লিজ"।
বিম্বিসার বললেন "এমন কিছু কথা বলিস না যাতে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমার মাথাটা ঠান্ডা রাখতে দে। জায়গাটায় আমাকে ড্রাইভ করে যেতে হবে। ভাবতে দে কী করলে তাতানের কাছে সব থেকে আগে পৌঁছনো যাবে"।
সুপ্রিয় ছটফট করতে শুরু করলেন।
বিম্বিসার ফোন বের করলেন। একটা জরুরি ফোন করতে হবে।

৭।

তাতান অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বলল, "আর কত হাঁটতে হবে বলুন তো? আমি আর পারছি না। এত ভিড়ের মধ্যে একটা লোককেও চিনি না। চিনলে আড্ডা মারা যেত। একটা মজার জিনিস দেখা যাচ্ছে, যারা বাসে করে এসেছে, তারা বাস থেকে নেমে হাঁটতে পারলেই ছুটি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাদের নিজের গাড়ি আছে, তারা কেস খাবে। গাড়ি ফেলে তো যাওয়া যাবে না। পুরো জ্যাম মিটলে, তারপরে যেতে পারবে"।
যযাতি বললেন, "তোমার কোন চিন্তা হচ্ছে না? বাড়ির লোক চিন্তা করছে, নিশ্চয়ই মিথ্যে বলে বেরিয়েছো?"
তাতান বলল, "চিন্তা করে লাভ নেই। তুমুল ঝাড় ইজ ওয়েটিং ফর মি। ওসব ভেবে কী হবে? হিহি"।
একটা মোবাইলের দোকান খোলা আছে। যযাতি বললেন, "তোমার ফোনটা দাও। চার্জ দিয়ে নি"।
তাতান খুশি হল, "গুড আইডিয়া"।
যযাতি দোকানটার দিকে রওনা হতে না হতেই পাথর ছুঁড়ছে কেউ বা কারা। তাতানের হাত ধরে একটা সরু গলিতে ঢুকে গেলেন।
তাতান বলল, "শিট। এ আবার কী?"
যযাতি দেখলেন বেশ কিছু লোক স্লোগান দিতে দিতে ভাঙা ফ্লাইওভারের দিকে রওনা হয়েছে। তিন চারজন পুলিশের গায়েও ঢিল লেগেছে। তারা তেড়ে গেল। লোকগুলোর ছত্রভঙ্গ হতে বেশিক্ষণ লাগল না। বেশ কিছু গাড়ির কাঁচ ভাঙল।
গাড়ি চালকেরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে হল্লা শুরু করেছে।
যযাতি বললেন, "চল। এখানে দাঁড়ানো যাবে না। এই জন্যই বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম"।
তাতান বলল, "এটাকেই কি কেয়ামতের রাত বলে? আমি বাংলাদেশের একটা বই পড়ছিলাম। ওখানে কেয়ামতের দিন বা রাত টাইপের টার্ম চোখে পড়েছিল"।
যযাতি বললেন, "হতে পারে। শুনে ভাল লাগল, তুমি বই পড়"।
তাতান বলল, "মাঝে মাঝে পড়ি। প্রেম করার সময়গুলো বই পড়া হয় না। তখন বয়ফ্রেন্ডকে মেসেজ না করলে সে ভেবে নেয় আমি অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করছি"।
যযাতি বললেন, "তাহলে সেটা প্রেম কেন হবে? এত ইনসিকিউরিটি থাকলে সেটা প্রেম হয় না"।
তাতান বলল, "হয়। আপনি প্রেম করেছেন কখনো?"
যযাতি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন, "না। করা হয় নি"।
তাতান বলল, "শিওর করেছেন। এই যে চুপ করে গেলেন, এর মানে হল করেছেন"।
যযাতি বললেন, "করলেও আমার তোমার বয়সী একটা মেয়ে থাকত। বড়দের সঙ্গে এভাবে কথা বোল না। বাড়িতে বাবা মার সামনে বললে বকা খাও না?"

তাতান বলল, "খাই তো। তা বলে এখানে তো আমি স্বাধীন। এর এ কথার উত্তর না দেওয়ার কী আছে?"
যযাতি বললেন, "হতে পারে আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে কোন সমস্যা আছে। প্রশ্নটা আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে"।
তাতান বলল, "তা হতে পারে। ঠিক আছে। এই ব্যাপারটা থাক"।
ক্রসিঙে পৌঁছে দেখা গেল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। যযাতি গিয়ে ট্যাক্সিচালককে বললেন, "বেহালা যাবে?"
ট্যাক্সি ড্রাইভার খৈনি ডলতে ডলতে বলল, "তেল নেই। কোথাও যাবো না"।
যযাতি বলল, "এক্সট্রা টাকা দেব"।
ট্যাক্সি ড্রাইভার রেগে গিয়ে বলল, "বলছি তো তেল নেই"।
চারদিকে তাকালেন। এদিকটায় পুলিশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে বললেন, "এখান থেকে মেট্রো স্টেশন কতদূর বলতে পারবেন? বেহালা যেতে হত।"
অফিসার বললেন, "মেট্রো বন্ধ করে দিয়েছে তো। গিয়ে লাভ নেই। ওদিকেও বিক্ষোভ চলছে। এদিক থেকে বেহালা যেতে পাঁচ ছ ঘন্টা লেগে যাবে"।
যযাতি হাল ছেড়ে দিলেন।
মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর কোন উপায় নেই।
তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরেকটু হাঁটতে পারবে? আমার পরিচিত একজনের বাড়ি আছে। তবে এখনো এক দেড় কিলোমিটার"।
তাতান ব্যাজার মুখে বলল, "ধুস। আর কত হাঁটব? আর পারছি না"।
যযাতি বললেন, "চল। এছাড়া আর কোন উপায় নেই বললাম তো"।
তাতান বলল, "এক দেড় কিলোমিটারটা একটু বেশি হয়ে যায় না? রিক্সা ম্যানেজ করা যায় না?"
যযাতি বললেন, "তুমিই দেখো। রিক্সা পাওয়া গেলে তো ভালোই। একটা দোকানপাটও খোলা নেই"।
তাতান বলল, "ধুস, সব কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেছে। আজকে দিনটাই খারাপ। পৃথ্বী স্কাউন্ড্রেলটার সঙ্গে এদ্দুর না এলেই ভাল হত। মিথ্যা বললাম বাড়িতে। কী যে ওয়েট করে আছে কে জানে"।
যযাতি বললেন, "তাহলে আজকের পর থেকে আর মিথ্যে বলবে না তো?"
তাতান বলল, "জানি না। না বলার চান্সই বেশি। একটা মিথ্যেতে কত বড় কেস হয়ে গেল বাপরে"।
যযাতি হাসলেন, "আমিও প্রতিটা রেজাল্টের পর ভাবতাম পরের বার থেকে ভাল করে পড়ব"।
তাতান মুখ বাঁকাল, "না আমি আপনার মত না। আমি মিথ্যে বলব না"।
যযাতি কাঁধ ঝাঁকালেন, "তাহলে তো ভালই। চল পা চালিয়ে"।
তাতান একটা বন্ধ চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসল, "যাচ্ছি, একটু বসে নি। কোন দিন এত হাঁটি নি আমি। বাড়ি থেকে বেরোই, অটো নি, ব্যস ঝামেলা খতম। মাঝে মাঝে বাবাও লিফট দেয়"।
যযাতি বললেন, "তোমার বাবার ব্যাপারে কী বলছিলে?"
তাতান বলল, "আমার মা ছোটবেলায় মারা যান। তারপর থেকে আমি আরেকটা ফ্যামিলিতে মানুষ। বায়োলজিকাল ফাদার যে, কোন কালে আসেন নি, এখন মাঝে মাঝে আসেন, আর পাতার পর পাতা জ্ঞান ঝাড়েন। আমার একটুও ভাল লাগে না"।
যযাতি বললেন, "হতে পারে তার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল। যত বেশি মানুষের থেকে ভালোবাসা পেতে পারো, ততো ভালো তো ব্যাপারটা, তাই না?"
তাতান বলল, "একবারেই না। বেশি ভালবাসায় বদহজম হয়। ওই তো পৃথ্বী, আমার ফোনটা আপনাকে দেখালে বুঝতেন। সারাক্ষণ আই লাভ ইউ বেবি, আই কান্ট লিভ উইদাউট বেবি করত। এখন দেখি

আমাকে লুকিয়ে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে চ্যাট করে। এত ভালোবেসে যদি মানুষ আমাকে ডিচ করে, তাহলে সে ভালোবাসায় আমার দরকার নেই"।

যযাতি বললেন, "দুটো ভালোবাসার মধ্যে তফাৎ আছে কিন্তু। রক্তের সম্পর্কের ব্যাপারটা আলাদা"।

তাতান বলল, "মোটেও আলাদা না। আমায় যারা বড় করে তুলেছেন, তাদের দেখলে এই কথাটা আপনি বলতেন না। তাদের জন্যই কষ্ট হচ্ছে বেশি। মা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি তাকেও এই পৃথ্বীর ব্যাপারে সব কিছু বলি নি। মনে হচ্ছে ভুল করেছি। উচিত ছিল বাকিটাও বলে দেওয়া"।

যযাতি বললেন, "বলতে পারতে। শহরটা তো আর এত সহজ সরল নেই। চল হাঁটতে শুরু করা যাক"।

তাতান উঠে বলল, "আমি একটানা হাঁটতে পারব না কিন্তু। মাঝে মাঝে রেস্ট নেব"।

যযাতি বললেন, "তাই কোর। এবার চল"।

৮।

কলকাতা পুলিশে বিম্বিসারের বন্ধু তথাগত আছেন। বিম্বিসার তাকে ফোন করলেন।

তথাগতর ফোন প্রথমে ব্যস্ত ছিল।

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে পাওয়া গেল।

তথাগত বললেন, "খুব বিজি আছি রে। কিছু বলবি?"

বিম্বিসার বললেন, "তাতানের ব্যাপারে কথা ছিল"।

তথাগত বললেন, "কী হয়েছে?"

বিম্বিসার সবটা বললেন।

তথাগত বললেন, "শিট। মেয়েটা আর প্রেম করতে যাবার দিন পেল না? এত কন্ট্রোলে রাখিস তোরা, তারপরেও এই অবস্থা?"

বিম্বিসার চুপ করে খোঁচাটা হজম করলেন। তবে তথাগত ভুল তো কিছু বলেন নি। ছোট্ট তাতান কবে যে বড় হয়ে গেল, খেয়ালই করতে পারেন নি। বিভাবরীর থেকে কথাটা শোনার পর থেকে অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না। অস্থির লাগছে। মেয়েটাকে যতক্ষণ না সামনে দেখতে পাবেন, মাথা কাজ করবে না।

বিম্বিসার বললেন, "তাতানের ছবি পাঠাচ্ছি। তুই যেভাবে হোক ওখানে এই ডেসক্রিপশনের কাউকে পেলে আমাকে জানা। মেয়েটা কোথায় আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না"।

তথাগত বললেন, "এখনো উদ্ধারকাজ ঠিক করে শুরু হয় নি রে। একেকটা বাস, ট্যাক্সি সব কংক্রিটের চাইয়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে। আর ঈশ্বর করেন, যদি এর মধ্যে না থাকে, তাহলে তুই চিন্তা করিস না। আমি সব থানায় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ল্যান্ডলাইনগুলো কোন কারণে আউট অফ অর্ডার হয়ে গেছে। শুধু ওয়্যারলেসগুলো চলছে। টেলিফোন কোম্পানির লোকজন কাজ করছে। স্টেডি হয়ে যাবে আশা করি। আপাতত মাথা ঠান্ডা রাখ"।

বিম্বিসার ফোন রেখে দেখলেন পাশের সিটে সুপ্রিয় চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাকে ফোন রাখতে দেখে বললেন, "তাতানের ছেলে বন্ধু ছিল, তুই জানতিস না?"

বিম্বিসার বললেন, "আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্ল ফ্রেন্ড আছে নাকি, সেটা বোঝা কি এতই সোজা? আমাকে না বললে আমি কী করে জানব? আর ছেলে বন্ধু থাকলেই যে সে লাভার হয়ে যাবে, সেটা বোঝা বাবা মায়েদের পক্ষে অসম্ভব। যুগটা পাল্টেছে।"

সুপ্রিয় বললেন, "রাতে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে নিয়ম চালু করিস নি কেন? আমাদের সময় আমরা সন্ধ্যে ছ'টার পর বাড়িতে ঢুকলে কপালে লাঠির বাড়ি জুটত"।

বিম্বিসার বললেন, "জোর করে এই জেনারেশনকে আটকানো যায় না। এখন মোবাইলের যুগ ভুলে যাস না"।

সুপ্রিয় বললেন, "তাতে লাভ কী হয়? তাতান এখনো আমার ফোন সব সময় ধরে না। জানি না কোন বিষ ঢুকেছে ওর মনে"।
বিম্বিসার বললেন, "সে তো আমার ফোনও ধরে না। ক্লাসে বা সেমিনারে থাকলে কী করে ফোন ধরবে"?
সুপ্রিয় বললেন, "কিংবা প্রেম করলে! টিনেজ প্রেগনেন্সি কীভাবে দেশে বাড়ছে, তোর কোন আইডিয়া আছে?"
বিম্বিসার অনেক কষ্টে মাথা ঠিক রাখলেন। বললেন, "আমাদের মেয়ে ওসব করে নি। দয়া করে তুই এসব কথা বন্ধ কর"।
গাড়ি স্টার্ট দিলেন তিনি।
গাড়ির এফ এম চালু হল। ফ্লাইওভারের দুর্ঘটনার ধারাবিবরণী চলছে।
বিভাবরী বললেন, "প্লিজ বন্ধ কর। শোনা যাচ্ছে না"।
বিম্বিসার বললেন, "কিছু করার নেই। এর থেকেও যদি কিছু জানা যায়, তাই শুনে যেতেই হবে"।
বড় রাস্তার ক্রসিংয়ে তুমুল জ্যাম। বিভাবরী বললেন, "মেয়েটা যেন জ্যামে আটকে থাকে ঠাকুর। আমরা যেন সব থেকে খারাপটাই ভাবছি। মেয়েটার যেন কোন ক্ষতি না হয়"।
বিম্বিসার সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।
সুপ্রিয় বললেন, "এখানেও মেট্রোর ফ্লাইওভারের কনস্ট্রাকশান চলছে। কোন দিন না এই ফ্লাইওভারও ভেঙে পড়ে"।
বিম্বিসার লুকিং গ্লাসে বিভাবরীকে দেখলেন। তীব্র অপরাধবোধে ভুগছেন বিভাবরী। সুপ্রিয় এলে বিভাবরী গুটিয়ে যান। তাদের মেয়ে যে আসলে অন্য কারো সন্তান, ভাবলে সিঁটিয়ে যান।
সুপ্রিয় বললেন, "ছেলেটা কী করে?"
বিভাবরী বলল, "তাতানদের সঙ্গেই পড়ে"।
সুপ্রিয় বললেন, "মানে ওরই বয়সী। স্বামী স্ত্রীর বয়সের ডিফারেন্স হওয়া উচিত কম করে পাঁচ বছর। কোত্থেকে এসব সম্পর্কে জড়ায় এরা কে জানে। বয়স কম, নিজেরা নিজেদের রোমিও জুলিয়েট ভেবে বসে আছে। ছোট থেকেই মাথায় ইনজেক্ট করে দিতে হয়, সমবয়সীদের সঙ্গে প্রেম করব না"।
বিম্বিসার বললেন, "তুই একটা ডায়েরীতে লিখে দিয়ে যাস কী কী ইনজেক্ট করতে হবে। আমি করে দেব"।
সুপ্রিয় বললেন, "মেয়েটা ফিরুক। সব করে দেব। চিন্তা করিস না"।
বিম্বিসার বললেন, "নেগেটিভ ভাবছিস কেন? ফিরবে না কেন? তোর কি মাথা টাথা একবারে গেছে?"
সুপ্রিয় বললেন, "আমার কিছু ভাল লাগছে না। তাতান ছাড়া আমার কে আছে বল?"
বিম্বিসার বললেন, "আমাদেরও তাতান ছাড়া কেউ নেই। দয়া করে চুপ কর। মাথা ঠান্ডা কর"।
সুপ্রিয় "বেশ" বলে চুপ করে গেলেন।

৯।
"যযাতি। আমার মেয়েটাকে দেখো। আমি হয়ত বেশিদিন আর..."
মাস্টারমশাই কেঁদে ফেলেছিলেন কথাটা বলে। ক্যান্সারে ভুগছিলেন।
সুভদ্রা ছিলেন না সেদিন।
যযাতির সামনে পরীক্ষা।
কথাটা শুনে বাড়ি ফিরে সারারাত আর ঘুমোতে পারেন নি যযাতি। চাকরি বাকরি নেই। বিয়ে করে ফেললেও বউকে তো খাওয়াতে হবে! কী খাওয়াবেন? মাস্টারমশাই দেখতে বলছেন মানে কি বিয়ে করতে বলছেন? কিছু কি বুঝে গেছেন? নাকি সুভদ্রা বলে দিয়েছেন তার বাবাকে সবটা? যদি বলে থাকেন, কেন বলবেন? তাদের তো একসঙ্গে বলার ছিল!

ভোরবেলা উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন যযাতি। শেষ মেশ ঠিক করলেন কিছুতেই আর সুভদ্রার মুখোমুখি হবেন না। স্বার্থপর হতে হবে।

ও বাড়িতে যাবেন না আর কিছুতেই। জীবন কারো জন্য থেমে থাকে না।

সুভদ্রা নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে।

মাস্টারমশাই মারা গেছিলেন খবর পেয়েছিলেন। যযাতি আর সে বাড়িটার ধারে কাছে যান নি।

চাকরির কাগজটা নিয়ে বাড়িটার কাছে গিয়েও পালিয়ে গেছিলেন তিনি। সাহস হয় নি অতদিন পরে সুভদ্রার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর।

হয়ত বিক্রি হয়ে গেছে বাড়িটা। অন্য কেউ আছে। ঠিকানাটা তো চেনা। একবার গিয়েই দেখা যাক ভেবে হাঁটছিলেন যযাতি।

তাতান দু বার বিশ্রাম নিল রাস্তায়। বলল, “আর জীবনেও মার অবাধ্য হব না আমি। সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি। প্রশ্নই আসে না অবাধ্য হবার”।

অনেকদিন পরে বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়ালেন তিনি।

তাতান বলল, “আপনার চেনা? উফ, বাঁচালেন। হেঁটে হেঁটে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। আমার পা ব্যথা করছে। আমি আর কোথাও যেতে পারবো না”।

মেয়েটা সত্যিই অনেকটা পথ হেঁটেছে। তার হাঁটার অভ্যাস আছে। মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারেন তিনি।

আজকালকার ছেলে মেয়েরা ওজন কমানোর কারণ না থাকলে এত হাঁটে না। অথচ হেঁটে আবিষ্কার করার মত কত কিছু আছে।

বাড়িটা একই রকম আছে। খুব বেশি পাল্টায় নি।

কলিং বেল বাজাতে যে দরজা খুললেন, তাকে দেখে যযাতির হার্ট বিট মিস করল।

কী আশ্চর্য!

সুভদ্রা!?

বিয়ে করে নি? একা একাই থেকে গেল? একের পর এক প্রশ্ন মাথায় আসতে শুরু করলেও যযাতি কিছু বললেন না।

পৃথিবীতে এভাবেই হয়ত সব বৃত্তেরা এসে কোথাও মিলে যায়।

যযাতি অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে বললেন “ভাল আছো?”

সুভদ্রা তাতানকে দেখলেন। তাতান মাটিতেই বসে পড়েছে।

জিজ্ঞাসু চোখে যযাতির দিকে তাকালেন সুভদ্রা।

যযাতি বললেন, “ওর নাম তাতান। বেহালায় থাকে। ব্রিজ ভেঙেছে বলে বাড়ি যেতে পারছে না। ওকে পৌঁছতেই যাচ্ছিলাম...”

যযাতি চুপ করে গেলেন।

সুভদ্রা তাতানকে ধরে তুললেন, “এসো”।

যযাতি সুভদ্রার দিকে এক বার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

সুভদ্রা যযাতিকে বললেন, “ইচ্ছে হলে এসো”।

সেই হল ঘর। তাকে তাকে বই।

তাতান দেখে বলল, “ওরে বাবা। কত বই! উফ!!!”

সুভদ্রা তাতানকে যত্ন করে বসালেন।

যযাতি ঘরে ঢুকে তাতানকে বললেন, “তোমার ফোনটা ওকে দাও। ফোনটা চার্জ করে বাড়িতে ফোন কর”।

তাতান বলল, “ঠিক ঠিক। এখনই দিচ্ছি”।

ব্যাগ থেকে ফোন বের করে সুভদ্রাকে দিতে গিয়ে চমকে উঠল, "এ বাবা"।
যযাতি দেখলেন ফোনের স্ক্রিণটা ভেঙে বেরিয়ে গেছে।
তাতান কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "স্কাউন্ড্রেলটার সঙ্গে ঝগড়ার সময় ফোনটা পড়ে গেছিল। দেখিনি"।
সুভদ্রা যযাতির দিকে তাকালেন, "কোন স্কাউন্ড্রেলটা?"
তাতান তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা শুরু করল, "আমার একটা বয়ফ্রেন্ড ছিল বুঝলেন? আমাকে ডিচ করেছে। একদম জঘন্য একটা ছেলে। জেলে দেওয়া উচিত"।
সুভদ্রা তাতানের কাঁধে হাত রাখলেন, "ওহ। ঠিক আছে, অনেক ছেলেই এমন হয়। তোমার বাবা মাকে খবর দাও নি?"
তাতান বলল, "না তো। কী হবে এবার? আমি কী করে ফিরব?"
জানলার বাইরে হুটারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সি এম যাচ্ছেন। রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
সুভদ্রা যযাতির দিকে তাকালেন, "কী প্ল্যান ছিল?"
যযাতি বললেন, "প্রথমে ভেবেছিলাম ট্যাক্সিতে তুলে দেব। পরে ভেবে দেখলাম একা ছাড়া ঠিক হবে না। বাড়ি দিয়ে আসতে গেছিলাম। রাস্তায় আটকে গেলাম"।
সুভদ্রা বললেন, "কারো কিছু খাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই?"
তাতান বলল, "তাই তো! খাবার কথা একবারও ভাবি নি। আমার খিদেও পেয়েছে খুব"।
সুভদ্রা বললেন, "দেখছি"।
রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলেন সুভদ্রা।
যযাতি চুপ করে বসে রইলেন। প্রবল একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বুঝতে পারছেন এখানে চলে আসাটা একবারে উচিত হয় নি। কিছু করারও ছিল না। রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল নয়। এক দিকে ঝামেলা লেগে গেছে। মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যেতেন? এখানে না এলে সমস্যা আরো বেড়ে যেত। সামলানো যেতো না।
এক একটা দিন এমন আসে, যখন চেনা শহরটাও অচেনা হয়ে যায়।
মানুষ তো দূর, জড় বস্তুগুলোকেও অচেনা মনে হয়।
কয়েক মিনিট পর সুভদ্রা এসে বললেন, "ভাত বসিয়ে দিয়েছি। থানা সহ বেশ কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। কোথাও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। টোটাল ম্যাসাকার চলছে। তবু দেখছি কিছু করা যায় কিনা। আপাতত ক্রিম ক্র্যাকার চলবে?"
বিস্কুটের টিনটা তাতানের দিকে এগিয়ে দিলেন সুভদ্রা।
তাতান ক্ষুধার্তের মত বিস্কুটের কামড় দিল।

১০।
রেড জোনের তিন কিলোমিটার আগে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ।
গাড়ি পার্ক করারও জায়গা নেই।
বিম্বিসার তথাগতকে বার বার ফোন করছেন। ফোন পাওয়া যাচ্ছে না।
সুপ্রিয় ছটফট করছিলেন। মিনিট পাঁচেক পর বললেন, "আমি যাচ্ছি"।
দরজা খুলে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন সুপ্রিয়।
বিভাবরী বললেন, "কী করব? যাব?"
বিম্বিসার রাগী গলায় বললেন, "কোথাও যেতে হবে না। যেতে দাও ওকে। সারাজীবন তো কোন কম্ম করল না। এখন অধিকার ফলাতে এসে গেছে"।
বিভাবরী বললেন, "তুমি এরকম করে বলছো কেন? তাতান তোমার মেয়ে না?"

বিম্বিসার বললেন, "তুমি আমাকে একবারও বলবে না তাতান কার না কার সঙ্গে কী করে বেড়াচ্ছে? মানে একবারও মনে হল না এইটুকু মেয়ে এসব করে বেড়াবে আর আমাকে ইনফর্ম করা দরকার?"
বিভাবরী বললেন, "আমি ভাবতে পারি নি যে ও টিউশন ফাঁকি দিয়ে এত দূর চলে যাবে"।
এফ এম বন্ধ করলেন বিম্বিসার। একদল চ্যাংড়া টাইপের ছেলে নিজেদের মধ্যে গালাগাল দিতে দিতে তাদের গাড়ি পেরোল।
কেউ মজা দেখতে এসেছে, কারো বা স্বজন বিয়োগ হয়েছে। গাড়িগুলোকে পুলিশ অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়া শুরু করেছে। লাঠি পড়ছে গাড়িতে।
গাড়ি ঘুরছে। একজন সিভিক পুলিশ গাড়ির কাছে এসে চিৎকার করল, "গাড়ি ঘুরিয়ে নে, ওদিকে যাওয়া যাবে না"।
বিম্বিসার রেগে গেলেন, "এই, তোর বাপের বয়সী আমি, তুই তোকারি করছিস কেন?"
সিভিক পুলিশ ঝামেলায় গেল না। বলল, "গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, যাওয়া যাবে না"।
বিম্বিসার বললেন, "আমি এখানে গাড়ি রাখব। আমার মেয়ে আটকে আছে"।
সিভিক পুলিশ বলল, "এখানে নো পার্কিং আছে। দূরে গাড়ি রেখে আসুন"।
বিম্বিসার বললেন, "দূর মানে?"
সিভিক পুলিশ বলল, "দেড় দু কিলোমিটার"।
বিম্বিসার রাস্তার বাঁ দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিভাবরীকে বললেন, "নামো তো"।
সিভিক পুলিশ দৌড়ে এল। বলল, "কী হল?"
বিম্বিসার বললেন, "গাড়ি এখানেই থাকল। ক্রেন দিয়ে নিয়ে যাওয়ার হলে নিয়ে যেও। আমি কোথাও যেতে পারছি না। ইয়ার্কি হচ্ছে? আমার মেয়ের কী হয়েছে আমি জানি না, আর এখানে নিয়ম দেখাচ্ছে!"
সিভিক পুলিশ বলল, "আপনি গাড়িটা পিছনে রেখে আসুন। এখানে ঝামেলা হবার চান্স আছে। এত গাড়ি বেরোবে। অন্যের অসুবিধা হবে"।
বিম্বিসার বললেন, "হোক। থাকল গাড়ি। এই চল"।
বিম্বিসার হাঁটতে শুরু করলেন। তার পিছনে বিভাবরী।
সিভিক পুলিশ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
সুপ্রিয়কে দেখা গেল না।
অনেকটা এগিয়ে গেছে।
বিম্বিসার অফিস করে, এতটা ড্রাইভ করে ক্লান্ত হলেও হেঁটে যাচ্ছেন।
বিভাবরী পিছিয়ে পড়ছেন।
বিম্বিসার ভ্রুক্ষেপ করছেন না।
কিছুক্ষণ পরে যখন বিভাবরী অনেকটা পিছিয়ে গেলেন, বিম্বিসার দাঁড়ালেন। বললেন, "একটাই অ্যাফেয়ার তো? আর ছিল না তো? এখন এদিক সেদিক গাদা গুচ্ছের হোটেল হয়েছে। সেখানে যায় না তো?"
বিভাবরী থমকে দাঁড়িয়ে বিম্বিসারকে দেখলেন, "সেটা জানি না"।
বিম্বিসার রাস্তার মধ্যেই চিৎকার করে উঠলেন, "কী জানো তবে? মা হয়েছো আর এটা জানো না? মা হওয়া এত সোজা? আমারই ভুল হয়েছিল তাতানকে নিয়ে আসা। তুমি অপদার্থ, সুপ্রিয় এখন বাবা হয়ে গেছে, আর আমাকে এগুলো চোখের সামনে দেখে যেতে হবে"।
রাস্তার বাকিরা তাদের দেখছে।
বিভাবরী আর নিতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন।
বিম্বিসার বিভাবরীর হাত ধরে টানলেন, "চল। দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার মাথা যে কোন মুহূর্তে ফেটে বেরিয়ে যাবে। আমি আর নিতে পারছি না"।

বিভাবরী কেঁদে উঠলেন, "প্লিজ ছাড়ো আমায়। আমার লাগছে"।
বিম্বিসার হাত ছেড়ে দৌড়তে শুরু করলেন।
সুপ্রিয় অনেকটা এগিয়ে গেছে। এতদিন পর পর এসে মেয়ের উপর অধিকার ফলাবে? কতটা এগিয়েছে?
জল দিচ্ছে রাস্তার পাশে। বিম্বিসার জলের পাউচ নিয়ে নিজের মাথায় ঢেলে দিলেন।
সবাই হাঁ করে তার দিকে তাকাচ্ছে। বিভাবরীও।
এতদিনের ঠান্ডা মাথার মানুষটা পাল্টে গেছে।
অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন বিম্বিসারের দিকে।

১১।
একটা পুরনো ম্যাগাজিন পড়ে আছে টেবিলের উপরে।
"শ্রুতকীর্তি"।
যযাতি চিনতে পারলেন।
বইটার দুটো ইস্যু বেরিয়েছিল। দুটোতেই তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।
একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন বঙ্কিমের লেখায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব নিয়ে। দ্বিতীয়টা মুঘল যুগ কেন ভারতবর্ষের উপর আশীর্বাদের মত এসেছিল, তা নিয়ে। সুভদ্রার সঙ্গে রীতিমত তর্ক বেঁধে যেত।
সেদিন মাস্টারমশাই বেরিয়েছিলেন কোথাও। যযাতি এসে দেখলেন সুভদ্রা একটা খাতায় হিজিবিজি কেটে যাচ্ছে।
তাকে দেখে বললেন, "একটা ম্যাগাজিনের নাম বল তো"।
যযাতি বললেন, "কত নাম আছে। বাজার চলতি ম্যাগাজিনগুলো তো মাস্টারমশাই সবই রাখেন"।
সুভদ্রা রেগে গেলেন, "ধুস, সেসব কে বলেছে? আমি বলছি নতুন কোন নাম বলতে"।
যযাতি বললেন, "কী করবে নতুন নাম দিয়ে?"
সুভদ্রা হাসলেন, "একটা নতুন ম্যাগাজিন করব। নামই ঠিক করতে পারছি না। একটা ভাল নাম চাই বুঝলে?"
যযাতি বললেন, "শ্রুতকীর্তি নামটা ভাল?"
সুভদ্রা লাফিয়ে উঠলেন, "দারুণ। এখনই ভাবলে?"
যযাতি বললেন, "হ্যাঁ। হঠাৎ করেই মাথায় এল?"
সুভদ্রা তাড়াতাড়ি নামটা লিখে বললেন, "এটাই বেস্ট। এটাই থাক। মাথা বটে তোমার এক খানা। সব সময় আইডিয়ার চাষ চলছে"।
যযাতি বললেন, "না না সেসব কিছু না। এমনি মাথায় এল"।
সুভদ্রা বললেন, "কিছু খেয়ে এসেছো? নিশ্চয়ই দুপুরে খাওয়া হয় নি? সোজা কলেজ থেকে চলে এসেছো?"
যযাতি বললেন, "মুড়ি খেয়েছি তো। অসুবিধা নেই"।
সুভদ্রা বললেন, "ওরে বাবা। বিরাট খাবার তো! মুড়ি! চল, চল, ভাত দিচ্ছি, খেয়ে নাও"।
ডাইনিং টেবিলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলেন তাকে সুভদ্রা।
ডাল, ছোট মাছের ঝাল, ভাত।
যযাতি বললেন, "তোমাদের জন্য আছে তো?"
সুভদ্রা বললেন, "হ্যাঁ। কেন থাকবে না? না খেয়ে ঘুরে বেড়াবে, একবার বলতে পারো না?"
যযাতি চুপ করে গেলেন।
চেয়ে চিন্তে খেতে কোন কালেই পারেন না।

সুভদ্রা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যযাতি চুপ করে খেয়ে যাচ্ছেন। বললেন, "রান্না খুব ভাল হয়েছে। তুমি করেছো?"
সুভদ্রা বললেন, "এটা এমন কিছুই রান্না নয়। তুমি বাড়িয়ে বোল না তো"।
যযাতি বললেন, "আর কী কী পারো?"
সুভদ্রা বললেন, "অনেক কিছু পারি। পোস্ত বড়া করে খাওয়াবো একদিন। আচ্ছা শোন না। ম্যাগাজিনে কে কে লিখবে? বাবা বলল বড় লেখক না, যারা নতুন লিখছেন, তাদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। ম্যাগাজিনে শুধু তারাই লিখবেন। তুমি কাউকে চেনো?"
যযাতি খেতে খেতেই ভাবতে শুরু করলেন...
#
"খাবার দিয়েছি"।
সুভদ্রার কথায় ফ্ল্যাশব্যাকটা কেটে গেল যযাতির।
তাতান মন দিয়ে একটা বই পড়ছিল।
যযাতি বললেন, "তাতান। খেয়ে নেবে চল"।
তাতান উঠল, "হ্যাঁ। খুব খিদে পেয়েছে সত্যি"।
সেই টেবিল। ডাইনিং রুমের কিছু কিছু জিনিস পাল্টেছে। বাকি সব কম বেশি একই আছে।
আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ, আর ভাত।
তাতান লাফিয়ে উঠল, "ঈশ, আমার ফেবারিট"।
যযাতি ইতস্তত করছিলেন।
সুভদ্রা বললেন, "বস। খেয়ে নাও"।
যযাতি বসলেন।
তাতান সুভদ্রাকে বলল, "একটু মেখে দেবে? আমি গরম ভাত মাখতে পারি না। মা মেখে দেয়"।
সুভদ্রা হেসে হাত ধুয়ে এসে ভাত মেখে দিলেন। বললেন, "মাখন দিই?"
তাতান ঘাড় নাড়ল, "দাও"।
সুভদ্রা ফ্রিজ থেকে মাখন বের করে দিলেন।
যযাতি মাথা নিচু করে খেতে শুরু করলেন।
সুভদ্রা যযাতিকে বললেন, "তুমি মাখন নেবে?"
যযাতি বললেন, "নাহ"।
সুভদ্রা বললেন, "কোলেস্টেরল বাঁধিয়েছো নাকি?"
যযাতি বললেন, "না না। আমার ওসব নেই। সকালে উঠে হাঁটি। ফিট আছি"।
সুভদ্রা বললেন, "তা ঠিক। তুমি আত্মসুখী মানুষ বরাবরই"।
যযাতি গুটিয়ে গেলেন। সুভদ্রার কথার তীর যে তার অভিমুখেই, সেটা বুঝতে ভুল হল না তার।
সুভদ্রা বললেন, "থানার ফোনে কোন সমস্যা হচ্ছে। বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার। ফোন পাওয়া গেলে অন্তত তাতানের বাড়ির লোক খবর পেয়ে যাবেন। তোমার ফোন নেই?"
তাতান বলল, "উনি ফোন ইউজ করেন না। সবার নাম্বার মুখস্ত রাখেন। ওর মাথাটাই ফোন বুক। উনি একজন লিজেন্ড। ওর কথা বন্ধুদের বলতে হবে"।
সুভদ্রা সামান্য হেসেই হাসিটা লুকিয়ে ফেললেন, "লিজেন্ডই বটে"।
যযাতি তড়িঘড়ি কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে বললেন, "অফিস টাইমে ফ্লাইওভার ভেঙে পড়ল। কী ভয়ংকর! ওদিকে তোমার কোন কাজ ছিল না তো?"
সুভদ্রা বললেন, "থাকলে খুশি হতে"?

তাতান খাওয়া থামিয়ে সুভদ্রার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, "তুমি দেখি আমার মার মত কথা বল। মাও বাবাকে এভাবে টন্ট করে। তোমার কে হয় গো?"
সুভদ্রা তাতানের মাথায় হাত বুলিয়ে যযাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেউ না"।

১২।
রথের মেলার মত ভিড় হয়ে গেছে। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েও সামাল দিতে পারছে না। বিম্বিসার ব্যারিকেডের কাছ অবধি এগিয়ে গেলেন।
বিরোধী দলের লোকেরা এসে স্লোগান দিচ্ছে।
বিম্বিসার তথাগতকে আরেকবার ফোন করার চেষ্টা করলেন।
পাওয়া গেল না।
নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না।
সামনে ভয়াবহ ধ্বংসাবশেষ। বিভাবরী বিম্বিসারের হাত ধরলেন, বিম্বিসার হাত ছাড়িয়ে নিলেন।
বিভাবরী বললেন, "তুমি রেগে যাচ্ছো কেন?"
বিম্বিসার বললেন, "কী করব এখন আমি? এখান থেকে কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব?"
হঠাৎ সুপ্রিয় দৌড়ে এসে বিম্বিসারকে ধাক্কা মারলেন, বিম্বিসার প্রস্তুত ছিলেন না। পড়ে গেলেন রাস্তার একজনের গায়ে। সুপ্রিয় চিৎকার করতে শুরু করলেন, "একটা কাজ নিয়েছিলি, সেটাও ঠিক করে করতে পারলি না। আমার মেয়েটার যদি কিছু হয়, তোকে আমি ছাড়ব না। মেরে ফেলব দেখিস"।
বিভাবরী সুপ্রিয়র এই রূপ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন।
সুপ্রিয়কে কেউ আটকাল না। সুপ্রিয় ছুটে গিয়ে বিম্বিসারকে আবার মারতে গেলেন। বিম্বিসার এবার সুপ্রিয়কে আটকে পালটা আক্রমণ করলেন। সজোরে ঘুষি মারলেন সুপ্রিয়র মুখে।
সুপ্রিয়র নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল।
বিম্বিসার বললেন, "জানোয়ার! বিয়ে করার পর নিজের বউকে দেখলি না ঠিক করে, মেয়েটাকে আমাদের উপর দিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে এলি, এখন দখলদারি দেখানো হচ্ছে? তোর এত সাহস তুই আমার গায়ে হাত তুলিস?"
বিভাবরী বিম্বিসারের হাত ধরতে এলেন, "কী করছো তুমি? এরকম করছো কেন?"
কেঁদে ফেললেন বিভাবরী।
কাছে থাকা পুলিশেরা এগিয়ে এলেন, "কী হচ্ছে এখানে?"
বিভাবরী বললেন, "আমাদের মেয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না"।
অফিসার বললেন, "তা বলে আপনারা এখানে মারপিট করবেন নাকি? চলুন। এদিকে আসুন আপনারা দুজন"।
বিম্বিসার হাত তুললেন, "দেখুন অফিসার, আমার মেয়ে নিখোঁজ, এখন আমাকে একা ছেড়ে দিন"।
অফিসার কোন দিকে না তাকিয়ে সরাসরি বিম্বিসারের পায়ে লাঠিচার্জ করলেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে? আমাদের এমনিতেই ফেটে হাতে চলে এসেছে, তুই আমাকে অর্ডার দিবি? চল, চল, সাইড হ"।
জনগণ মজা দেখছিল।
সুপ্রিয় রাস্তায় বসে পড়ে হাঁফাচ্ছিলেন।
এবার চিৎকার করে উঠলেন, "তুই একটা জানোয়ার। একটা অমানুষ। আমি জানি, আমি যখন থাকতাম না, তুই নিয়মিত তৃণার সঙ্গে দেখা করতে যেতিস। চরিত্রহীন!"
বিম্বিসারের পায়ে লেগেছিল, সে অবস্থায় তেড়ে যাচ্ছিলেন।
অফিসার বললেন, "দুটোই চল। চল চল। এখানে থাকলে ঝামেলা হবেই"।

বিভাবরী বললেন, “প্লিজ স্যার, আমাদের মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না। টেনশনে ওরা এরকম করছেন। প্লিজ”।
অফিসার বাকিদের বললেন, “এই জায়গা খালি কর। ব্যারিকেড আরো পিছিয়ে দাও। আর এ দুজনের উপর নজর রাখো। কোন রকম ন্যুইসেন্স ক্রিয়েট করলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করবে। এত বড় একটা মিস হ্যাপ হয়ে গেছে, আর এরা রাস্তাঘাটকে বাড়ি পেয়েছে। চল”।
বিম্বিসারকে দূরে নিয়ে যাওয়া হল।
সুপ্রিয় হাঁফাচ্ছিলেন। বিভাবরীকে বললেন, “আমার মেয়ের কিছু হলে তোমাদের কাউকে আমি ছাড়বো না, মনে রেখো। বিভাবরী বিম্বিসারের দিকে তাকালেন। এই বিম্বিসারকে তিনি চিনতে পারছেন না। কিংবা পারছেন।
সন্তানের জন্য একটা সময় একটার পর একটা ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এরকম মুখই থাকত বিম্বিসারের।
সব হারানো একটা মুখ।
মেয়েটাকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন।
বিভাবরী কাঁদছিলেন। তারই দোষ।
কেন তাতানকে এত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তিনি? আগেই ছেলেটার ব্যাপারে বিম্বিসারকে বলা উচিত ছিল।
মা মেয়ে খুনসুটি চলত। মেয়ে বলত, বিভাবরী শুনতেন। কখনোই ভাবেন নি মজা থেকে ব্যাপারটা তাকে এই রাতে পৌঁছে দেবে। অসহায় এবং অভিশপ্ত একটা রাত। চারদিকে শুধু মানুষ আর হাহাকার। বিম্বিসার মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। সুপ্রিয় একা একা বিড় বিড় করে চলেছেন।
সুপ্রিয় বললেন, “আমার উচিত ছিল কোথাও না যাওয়া। শুধু মেয়েটাকে মানুষ করা। আমার ভুল। সব আমার ভুল। পালিয়ে গেছি সারা জীবন নিজের সন্তানের থেকে। ছি ছি, আমার জন্য আজ মেয়েটা... ভুল করেছি। বিরাট ভুল করেছি”।
বিভাবরী দেখলেন বিম্বিসার ফোন বের করেছেন। বার বার কাঁপা কাঁপা হাতে কারো একটা ফোন চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিছুতেই পাচ্ছেন না শত চেষ্টা করেও...
১৩।
“বাইরে অবস্থা ভাল না। ঝামেলা বাড়ছে। ফোনও পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। তাতান, তুমি আমার খাটে শুয়ে পড়। আমার মনে হয় আরেকটু রাত বাড়লে ফোন পাওয়া যাবে”।
সুভদ্রা বললেন।
তাতান বলল, “কাল থেকে আমার কাজ হবে আংকেলের মত সবার নাম্বার মুখস্ত করা। আর ফোন বুকের হেল্প নেব না”।
সুভদ্রা বললেন, “তাই নাকি? তোমার আংকেলের বুঝি সবার নাম্বার মুখস্ত? জিজ্ঞেস কর তো এই বাড়ির ল্যান্ডলাইনের নাম্বার কী ছিল?”
তাতান যযাতির দিকে তাকাল, “কী ছিল? পারবেন?”
যযাতি বই পড়ছিলেন। কারো দিকে না তাকিয়েই ল্যান্ডলাইনের নাম্বারটা বলে দিলেন।
তাতান সুভদ্রাকে বলল, “ঠিক বললেন?”
সুভদ্রা ঘাড় নাড়লেন, “তা ঠিকই বলেছেন। নাম্বারটুকু মনে রেখেছেন ফোন করাটুকু বাদ দিয়ে”।
তাতান বলল, “আমি একটা দারুণ লাভ স্টোরির গন্ধ পাচ্ছি। সত্যি করে বলবেন, আপনারা দারুণ জুটি ছিলেন, তাই না? তারপর হেব্বি ঝগড়া হল, ব্রেক আপ হয়ে গেল। সারাজীবন আর দেখা হল না। ঈশ! হাউ প্যাথেটিক”।
যযাতি তাতানের কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, “তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমি দেখছি কোথাও ফোন পাওয়া যায় কি না।“।
তাতান বলল, “আমি কোথাও যাব না। গল্পটা না শুনে আমি নড়বই না”।

যযাতি বই রেখে তাতানের দিকে তাকালেন, "তোমার মনে হয় না তুমি অন্যদের পার্সোনাল স্পেসে ঢুকে যাচ্ছো? তোমার প্রায়োরিটি এখন বাড়ি ফেরা। বাড়ির লোককে খবর দেওয়া। আমাকে বা সুভদ্রাকে কাউকেই তুমি চেনো না, কেন শুধু শুধু একটা অশান্তি তৈরী করতে চাইছো?"
তাতানের চোখে জল চলে এল। এত রূঢ়ভাবে কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। যযাতি এভাবে কথা বলবেন, সে আশা করে নি। সে উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেল।
সুভদ্রা রাগী গলায় বললেন, "এইটুকু মেয়ের সঙ্গে এভাবে না কথা বললেই হচ্ছিল না? নিজের ছেলে মেয়ের সঙ্গেও বুঝি তুমি এভাবেই কথা বল?"
যযাতি বললেন, "এতদিন পরে চোখে পড়ল, ম্যাগাজিনটায় আমার প্রবন্ধে দুটো বানান ভুল ছিল। তুমি প্রুফ চেক কর নি আমার লেখাটা? প্রুফের দায়িত্বে তুমি ছিলে। উচিত ছিল চেক করা"।
সুভদ্রা বললেন, "বেশ করেছি চেক করি নি। বিরক্তিকর শক্ত শক্ত ভাষা লিখে গেছো। পড়তে ইচ্ছেও হয় নি"।
যযাতি বললেন, "এই বাড়িতে ভূতের মত একা থাকো? ভয় লাগে না?"
সুভদ্রা বললেন, "সকালে আরতি দি আসেন। রাতটুকু একাই থাকি। অসুবিধা হয় নি। তাছাড়া একজন আমাকে এক কালে বলেছিল, ভূত বলে কিছু হয় না। সবই ভ্রম"।
যযাতি বললেন, "বিয়ে করলে না কেন?"
সুভদ্রা বললেন, "দরকার পড়ে নি। কারো কারো চলে যাবার পর গোটা পুরুষ জাতটার উপরেই বিশ্বাস উঠে যায়। বিয়ে করার কথা ভাবি নি তার পর থেকে"।
যযাতি বললেন, "আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া যায় না"?
সুভদ্রা অবাক হবার ভাব করলেন, "ক্ষমা? কেন ক্ষমা করার কথা আসছে কেন?"
যযাতি বললেন, "আমি দোষী। আমার উচিত ছিল মাস্টারমশাইয়ের দেওয়া দায়িত্ব পালন করা। আমি করি নি। ভয় পেয়ে গেছিলাম"।
সুভদ্রা বললেন, "বাবাও যেমন! আমাকে অবলা ভেবেছিল! এদিকে নিজেই শিখিয়ে গেছিল মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। পরনির্ভরশীল হতে নেই। শিখেছি তো। খুব ভালভাবে থাকি, যথেষ্ট ভাল চাকরি করি, আমার কাউকে দরকার পড়ে নি কোন দিন। দিব্যি আছি। তুমি এসব ভেবো না। দোষী নির্দোষের কিছু নেই। আমি জানতাম। তুমি অরুণাকে ভালবাসো। ওকেই বিয়ে করেছো?"
যযাতি অবাক চোখে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না। এটা তোমাকে কে বলেছিল? আমি বিয়ে করি নি কোন কালে। তাছাড়া অরুণাকে কেন ভালবাসতে যাব?"
সুভদ্রার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি এসে মিলিয়ে গেল, "ভেবেছিলাম। কাজ ছিল না তো একটা সময়। রাত জেগে জেগে ভাবতাম। ভেবেছিলাম ঠকিয়ে চলে গেছো। বিয়ে কর নি? রান্না কে করে দেয়?"
যযাতি বললেন, "হোটেলেই খাই। অফিসে ক্যান্টিনে"।
সুভদ্রা বললেন, "ঠিক সময়ে খাওয়া হয়? বয়স তো ভালই হয়েছে। অর্ধেকের বেশি চুল পেকে গেছে। লিভারের রোগ বাধিয়েছো?"
যযাতি বললেন, "পেট খারাপ হয় মাঝে মধ্যে। অফিস ছুটি নিয়ে শুয়ে থাকি। ক'টা দিন আর? এভাবেই একদিন চোখ বুজব"।
সুভদ্রা রাগী গলায় বললেন, "তা তো বলবেই। বরাবরের এসকেপিস্ট। পালিয়ে পালিয়ে যে বাঁচা যায় না, সেটা আজ বুঝতে পারলে? তাও ভাল, মেয়েটাকে রাস্তায় একা ছেড়ে পালাও নি। তোমার যা বোধ বুদ্ধি!"
যযাতি ম্লান হাসলেন, "বয়স বেড়েছে তো। বয়সজনিত রেসপন্সিবিলিটিটা বেড়েছে বলতে পারো। শ্রুতকীর্তি আর প্রকাশ পায় নি?"
সুভদ্রা বললেন, "নাহ। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হল যে। ম্যাগাজিন করা তখন বিলাসিতা হয়ে গেল"।

যযাতি বললেন, "আমি ভেবেছিলাম খুব বড় কোন বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছে। খুব সুখে সংসার করছো"।
সুভদ্রা বললেন, "তোমার কাছে একটা মেয়ের সুখের সংজ্ঞা কী? বরের টাকায় বসে ঠ্যাঙের উপর ঠাং তুলে রাজা উজির মারা?"
যযাতি বুঝলেন সুভদ্রা রেগে যাচ্ছেন। বললেন, "একবার থানায় ফোন করে দেখবে? এখন যদি পাওয়া যায়?"
সুভদ্রা বললেন, "বেঁচে যাও না এখান থেকে বেরোতে পারলে?"
যযাতি বললেন, "মেয়েটার বাড়ির লোকের কথা ভেবে বললাম। আমি কিছু বলছি না"।
সুভদ্রা বললেন, "সেই তো। তোমার আর কীই বা বলার আছে। দেখছি। ফোনটা মনে হয় বেডরুমে রেখে এলাম"।
সুভদ্রা তার বেডরুমে গিয়ে দেখলেন তাতান গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে।
কোন কারণ ছাড়াই তার চোখে জল চলে এল...

১৪।
পূর্ণিমা রাত।
কোপাইয়ের তীরে দুই পরিবার মিলে রিক্সা করে গেছে।
রিক্সাওয়ালারা বলে দিয়েছে বেশি রাত না করতে। সাপ খোপ থাকতে পারে।
তৃণার ইচ্ছে সারারাত থাকার। সুপ্রিয় কিছুতেই রাজি নয়।
ক্ষীণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে।
তৃণা হতাশ গলায় বলল, "এটা নদী? ঈশ! কী আশা করে এসেছিলাম!"
সুপ্রিয় বলল, "তুমি কী আশা করেছিলে? এই হয়, শহরের মানুষকে নিয়ে এলে"।
তৃণা বলল, "আমি শহুরে মোটেও নই। মফস্বলের মেয়ে। শহুরে খোঁটায় আমার কিছু যায় আসে না। বিভাকে বলতে পারো"।
বিভাবরী বলল, "থাম তো। এদের খালি পেছনে লাগা"।
বিম্বিসার সিগারেট ধরিয়েছে। বলল, "সুপ্রিয়, বহুদিন কোন গান শোনাস না। আজকে একটা গান হয়ে যাক"।
সুপ্রিয় বলল, "ধুস, এই মাঠের মধ্যে কী গান গাইবো?"
বিম্বিসার বলল, "গা গা। তোর হোনেওয়ালা বাচ্চাও শুনতে চাইছে"।
সুপ্রিয় বলল, "আমার গান আসবে না এখন। তুই গা বরং"।
বিভাবরী বলল, "তাহলেই হয়েছে। ও হেঁড়ে গলায় গাইবে, তারপর যত ভূত প্রেত দত্যি দানো আছে, চারদিক থেকে ছুটে এসে আমাদের গিলে খাবে। তুমি গাও"।
তৃণা বলল, "তোমায় গাইতে বললেই দেখেছি তোমার অহংকার বেড়ে যায়। বেশি গাই গুই না করে গাও তো"।
সুপ্রিয় বিম্বিসারের থেকে সিগারেটের কাউন্টার নিয়ে গান ধরল, "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"।
তৃণাও গাইতে শুরু করল।
চারপাশে কেউ নেই।
বিম্বিসার বিভাবরীর হাত ধরে রইল অনেকক্ষণ।
সুপ্রিয়র গান শেষ হতেই সবাই হাততালি দিল।
একজন রিক্সাওয়ালা বলে উঠল, "বাবু, খুব ভাল লাগল"।

বিম্বিসার বলল, "আর কলকাতা যেতে ইচ্ছে করছে না। কী ম্যাজিকাল অ্যাটমোস্ফিয়ার, তাই না?"
তৃণা বলল, "ঠিক তাই। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। এখন কী ভাল লাগছে। আর একটা প্রাণ জুড়ানো হাওয়া বইছে। তোমরা অফিস ছেড়ে দিয়ে শান্তিকেতনে বাড়ি কেনো তো। বেশি কিছু চাই না। মোটা চালের ভাত খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে"।
সুপ্রিয় বলল, "আর তোমার ট্যা-এর কী হবে? তিনি পারবেন মোটা চালের ভাত খেতে?"
তৃণা লজ্জা পেল, "চুপ কর তো। সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না"।
বিম্বিসার প্যান্টের পকেটে একটা ছোট বোতল লুকিয়ে এনেছিল। বের করে চুমুক দিয়ে বলল, "খাবি নাকি সুপ্রিয়?"
সুপ্রিয় বলল, "আহা। তোর মনে ছিল? বাঁচালি? তৃণা বেচারি খেতে পারবে না। আপাতত দেখো"।
বিভাবরী রেগে গেলো, "ঠিক লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে এসেছো? এই জন্য ভাল লাগে না। তোমরা আর মানুষ হলে না"। সুপ্রিয় বিম্বিসারের থেকে বোতলটা নিয়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "আহা। এই তো জীবন। এই তো বেঁচে থাকা"।
বিভাবরী তৃণাকে বলল, "চল। আমরা রিক্সায় গিয়ে বসি। গিলুক ওরা। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাকে না, ও মদকে বিয়ে করেছে"।
বিম্বিসার কান ধরল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঘাট হয়েছে। আর খাবো না। রাগ কোর না প্রাণেশ্বরী, চাও কি আমি প্রাণেই মরি?"
বিভাবরী বলল, "মরণ"!
সুপ্রিয় আর বিম্বিসার দুজনেই হেসে উঠল।
#
বিভাবরী চাঁদ দেখলেন। এই রাতটাও পূর্ণিমা মনে হয়। তফাৎটা হল, এখন তৃণা নেই, বক্সিং রিঙে দুই যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বীর মত বিম্বিসার আর সুপ্রিয় একে অপরের থেকে দূরে বসে আছে।
মাঝখান থেকে কেটে গিয়েছে কতগুলো বছর।
বিম্বিসারের ফোন বাজছিল।
বিম্বিসার দেখলেন তথাগত ফোন করছেন।
তড়িঘড়ি ধরলেন, "হ্যালো। উফ, কী ব্যাপার, কিছুতেই ফোন পাচ্ছিলাম না"।
তথাগত বললেন, "কিছু প্রবলেম ছিল। সমস্যা আছে। আচ্ছা, যেটা বলছি, তাতানের ঐ বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে কিছু জানা গেল? ব্যাটার নাম্বার পেলেও কিছু বের করা যেত কোথায় গেছিল ইত্যাদি"।
বিম্বিসার বললেন, "নাহ। আমি ছেলেটার ব্যাপারেই তো আজ জানলাম। কী বলব আর?"
তথাগত বললেন, "চিন্তা করিস না। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কতক্ষণ আর এসব মাল পালিয়ে বেড়াবে?"
বিম্বিসার বললেন, "অন্য কাউকে দোষ দিচ্ছি না তো। আমাদের মেয়েই তো কিছু বলে নি। অন্যের ছেলেকে বলে কী হবে? হাসপাতালগুলোয় খোঁজ নিয়েছিস?"
তথাগত বললেন, "এখনো পর্যন্ত নিউজ নেগেটিভ"।
বিম্বিসার শ্বাস ছাড়লেন, "ঠিক আছে। আমি জানি না এখন কী করব। বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছা করছে না"।
তথাগত বললেন, "বেশি ভাবিস না। তুই কি এসে গেছিস? কোথায় আছিস বল? আমি আসছি"।
বিম্বিসার বললেন, "ব্যারিকেডের এদিকেই আছি। সাউথের দিকে। তোদের এক অফিসার পায়ে লাঠি চার্জও করেছে"।
তথাগত বললেন, "সেকি? ওহ। টোটাল ক্যালাসনেস চলছে। আমি আসছি। ওয়েট কর"।
বিম্বিসার ফোন রাখলেন। একেকটা অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে, সুপ্রিয় ভীত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকছেন।
কতজন আহত, কতজন নিহত, কেউ কিছু বলতে পারছে না।

মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে যেন...
ভিড় ঠেলে তথাগত উদ্ধার করলেন বিম্বিসারকে।
ব্যারিকেডের ভিতরে বিম্বিসার আর বিভাবরীকে নিয়ে গেলেন। সুপ্রিয় চিৎকার করছিলেন।
বিম্বিসার ক্লান্ত গলায় বললেন, "ওকেও ডেকে নে। তাতানের বায়োলজিকাল ফাদার"।
জনগণ গালাগাল করছিল। কেন তাদের আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে। তথাগত পাত্তা দিলেন না।
বললেন, "তাতানের ফোনের লাস্ট লোকেশন পাওয়া গেছে। নর্থের দিকেই ছিল। তারপরে অফ হয়ে যায়"।
সুপ্রিয় মাথায় হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়লেন।
বিম্বিসার শূন্য চোখে বিভাবরীর দিকে তাকালেন।
সুপ্রিয় বললেন, "তোদের জন্য। তোদের জন্য। সব কিছু তোদের জন্য"।
তথাগত জিজ্ঞাসু চোখে বিম্বিসারের দিকে তাকালেন।
বিম্বিসার তথাগতকে বললেন, "আমরা এবার কী করব?"
তথাগত বিম্বিসারের কাঁধে হাত রাখলেন, "উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। কিছু না কিছু খবর পাওয়া যাবে। ভাবিস না"।
সুপ্রিয় উঠে দৌড়তে দৌড়তে ধ্বংসস্তুপের দিকে চলে গেলেন।
কর্মরত কনস্টেবলরা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন।
তথাগত বারণ করে দিলেন।
বিম্বিসার হতাশ গলায় বললেন, "আমরা দোষী হয়ে গেলাম মেয়েটার বাবার কাছে। আমাদের সব কিছু আজ তুচ্ছ হয়ে গেল"।
বিভাবরী মুখে আঁচল চাপা দিয়েছেন।
অনেক আটকেছেন। আর পারলেন না। কাঁদতে শুরু করলেন।
সামনের ধ্বংসস্তুপ দেখে বিম্বিসার বললেন, "মেয়েটাকে না নিয়ে আমাকে নিতে পারত। কী দোষ করেছিল মেয়েটা?"
বিভাবরী বললেন, "যদি বেঁচে থাকে? অনেকেই তো আটকে আছে। বের করলে বেঁচে যাবে না?"
তথাগত উত্তর না দিয়ে ব্যস্ততা দেখিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন।
কী বলে সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ আগেই একটা শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দেখে তার নিজেরই হড় হড় করে অনেকখানি বমি হয়ে গেছে।
একরকম আশা ছেড়ে দিয়েই বসে পড়লেন তথাগত।
পুলিশে কাজ করা হল অভিশাপ। এই সব পরিস্থিতিতে মনে হয় সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়লে ভাল হয়। তা আর সম্ভব হয় না।
ফোন বাজছিল তার।
তথাগত ধরলেন।
স্থানীয় থানা থেকে ফোন এসেছে, "হ্যাঁ স্যার। এই মাত্র একটা ফোন এসেছিল। মেয়েটির নাম কনফার্ম করেছে। আমাদের ফোন এই কয়েক মিনিট আগে ঠিক হল, প্রথম ফোনটা আপনার ব্যাপারেই এল"।
তথাগতর হৃদপিণ্ড যেন ফেটে বেরোচ্ছে, "বেঁচে আছে কিনা বলুন"।
"বেঁচে আছে স্যার। নর্থের দিকে এক বাড়িতে আছে। সেফ এন্ড সিকিওর"।
"ফটো পাঠাতে বলেছেন?"
"পাঠিয়েছে স্যার। আপনাকে পাঠাচ্ছি"।
"ওকে"।
ফোন কেটে হোয়াটস অ্যাপ খুললেন তথাগত।

নেটওয়ার্ক মারাত্মক স্লো। কিছুতেই ফটো লোড হচ্ছে না। রাগে ফোন ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তথাগতর।
বার চারেক চেষ্টার পরে অবশেষে ডাউনলোড করা গেল।
তাতানের ছবি পাঠিয়েছে।
ঘুম ঘুম চোখে হাসছে। পাশে এক অচেনা ভদ্রমহিলা।
বিম্বিসার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিভাবরী বমি করছেন রাস্তার উপরে।
তথাগত ছুটলেন বিম্বিসারের দিকে...

১৫ ।
"তাতানের তো ব্যবস্থা হয়ে গেল। তুমি কী করে ফিরবে?"
যযাতি "শ্রুতকীর্তি" পড়ছিলেন।
খবরে দেখাচ্ছে এখন অবধি কুড়িজনের মৃতদেহ বের করা গেছে। কিছুক্ষণ আগে বিভাবরীর সঙ্গে তাতানের কথা হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা এ বাড়িতে এসে তাকে নিয়ে যাবে।
তাতান বলল, "আচ্ছা আংকেল, তুমি তখন বাসে করে চলে না গেলে হয়ত আমরা ফ্লাইওভারের তলায় চাপা পড়ে যেতাম। তাই না?"
যযাতি কিছু বললেন না। মেয়েটা বড্ড বেশি কথা বলে, তবে বড্ড মায়াবী। এইটুকু সময়েই কেমন মায়া পড়ে গেল।
সুভদ্রা বললেন, "বাসে করে চলে গেছিল মানে?"
তাতান খিল খিল করে হেসে বলল, "আংকেল ভেবেছিল আমি বোধহয় কোন ছেলেধরা টরা হব। পালিয়ে গেছিল। পরে আবার দেখি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরল"।
সুভদ্রা হেসে ফেললেন।
যযাতি রাগী চোখে তাতানের দিকে তাকালেন।
তাতান বলল, "আমি আরেকটু শুয়ে নি ওরা আসতে আসতে। আংকেল যেভাবে তাকাচ্ছে, আমাকে ভস্মই করে দেবে মনে হয়"।
সুভদ্রা বললেন, "আচ্ছা, যাও"।
তাতান বেডরুমে চলে গেল।
সুভদ্রা বললেন, "তুমি কী করবে বললে না?"
যযাতি বললেন, "আমি উঠব। যতটা পারি হাঁটা লাগাব। পৌঁছে যাব হয়ত ভোরের মধ্যে"।
সুভদ্রা বললেন, "এই মাঝরাতে বেরিয়ে যাবে?"
যযাতি বললেন, "আমি হাঁটি তো। হাঁটতে ভাল লাগে আমার। শুক্রবারগুলো অফিস থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা অভ্যেস করেছি। মন্দ লাগে না"।
সুভদ্রা বললেন, "ভাল। সাবধানে থেকো। আজকাল রাস্তাঘাটগুলো যেন মরণ ফাঁদ হয়ে গেছে। কারা ভেবেছিল, বাড়ি থেকে বেরোবে আর ফ্লাইওভার ভেঙে পড়বে? সেদিন চোখের সামনে দেখলাম একটা লোক বাসে চাপা পড়ল। লোকটার কোন দোষই ছিল না। রেষারেষি করছিল বাসটা আরেকটা বাসের সঙ্গে। চোখে দেখা যায় না, উফ"!
যযাতি বললেন, "আমার কাছে একটাও কপি নেই ম্যাগাজিনের। একটা করে পাওয়া যাবে?"
সুভদ্রা বললেন, "একটা করেই আছে। নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যেও"।
যযাতি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "শ্রুতকীর্তি যদি হত, তাহলে এই তাতানের বয়সীই হত, তাই না?"
সুভদ্রা থমকালেন।

যযাতির দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, "সাবধানে যেও। এখনো বেরিয়ে যেতে পারো। আমি তো থাকছিই। তাতানের বাবা মা এলে আমিই ওদের হাতে তাতানকে তুলে দেব। ভেবো না"।
যযাতি উঠে দাঁড়ালেন।
পিছুটানেরা ডাকলেও মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতে নেই...
#
একটা বড় কংক্রিটের চাই তুলছে একটা ক্রেন। গ্যাস কাটার দিয়ে অন্য দিকের স্ট্রাকচার কাটা হচ্ছে।
সুপ্রিয় শূন্য চোখে দাঁড়িয়ে দেখছিলন।
তার কাঁধে হাত রাখলেন বিম্বিসার।
সুপ্রিয় বললেন, "এখানে মেয়েটা যদি চাপা পড়ে থাকে? কী করব আমি? আমার যেটুকু ছিল, তাও তো শেষ হয়ে যাবে"।
বিম্বিসার বললেন, "তাতানের খবর এসেছে সুপ্রিয়। ও ঠিক আছে"।
সুপ্রিয় চমকে ফিরে তাকালেন। মাটিতে শুয়ে পড়লেন।
সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সুপ্রিয়র সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। গুটি শুটি মেরে শুয়ে কেঁদে চলেছেন। বিম্বিসারও রাস্তায় বসে পড়লেন। সুপ্রিয়কে ধরে বসালেন।
সুপ্রিয় বিম্বিসারকে জড়িয়ে ধরলেন, "আমাকে ক্ষমা কর ভাই। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দে। সব দোষ আমার। আমি তোদের দোষ দিয়ে গেছি শুধু। আমি একটা পাষণ্ড। কী না কী বলে গেছি তোদের। ছি ছি, লজ্জা হচ্ছে। ঘেন্না হচ্ছে। আমি আর কোন দিন আসব না তোদের সংসারে। মেয়েটাকে নিয়ে ভাল থাক তোরা"।
বিম্বিসারও কাঁদছিলেন, সুপ্রিয়র পিঠ চাপড় মেরে বললেন, "ঠিক আছে। যা করেছিস, বেশ করেছিস। তোর জায়গায় থাকলে আমিও করতাম। হুইস্কি খাবি একটু? দেখব ব্ল্যাকে কোথাও পাওয়া যায় নাকি?"
সুপ্রিয় মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "সব মিটে গেলে আরেকবার শান্তিনিকেতন যাবি? মেয়েটাকে আজকাল খুব কোপাই নদী দেখাতে ইচ্ছে করে। সেই জায়গাটায় যাবো"।
বিম্বিসার বললেন, "যাবো। কাঁদিস না। অনেক কেঁদেছিস। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরিস"।
সুপ্রিয় মাথা নাড়লেন, "না রে। আগে বিভা ধরবে। তারপর আমরা। আমারই ভুল হয়েছিল। তাতান আগে বিভার মেয়ে। তারপর আমাদের"।
বিম্বিসার দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন, "তাই হোক। চল। তথাগত গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মেয়ের কাছে চল"।
সুপ্রিয় বিম্বসারের হাত ধরে উঠলেন।
দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করলেন।
ধ্বংসস্তুপ আর অসংখ্য হাহাকারকে পিছনে ফেলে...
#
"একী? উনি চলে গেলেন কেন"?
তাতান সুভদ্রাকে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।
সুভদ্রা বললেন, "উনি তো থাকতে আসেন নি। ওকে ফিরতে হবে তো"।
তাতান বলল, "ওর নাম্বার আছে? আমি ফোন করব। বাবা মার সঙ্গে কথা বলাব। লোকটা একটু কেমন যেন। কিন্তু ভাল। বল?"
সুভদ্রা হাসলেন, "হ্যাঁ। ভাল তো। খুব ভাল"।
তাতান বুঝল না। তবে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমিও খুব ভাল। ভীষণ ভাল"।
সুভদ্রা নিরুত্তর রইলেন।

চোখের জল আটকানোর অভ্যাস সেই কবে থেকে করে চলেছেন...